Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

হিংসা বিদ্বেষ পতনের মূল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সামিয়া ইয়াসমিন

রোলঃ ২৩১০০১২১০৯৬

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

হিংসা বিদ্বেষ পতনের মূলবিষয়ঃ

হিংসা বিদ্বেষ পতনের মূল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সামিয়া ইয়াসমিন

রোলঃ ২৩১০০১২১০৯৬

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " হিংসা বিদ্বেষ পতনের মূল " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সামিয়া ইয়াসমিন, আইডিঃ ২৩১০০১২১০৯৬ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ হিংসা বিদ্বেষ পতনের মূল ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

সামিয়া ইয়াসমিন

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সামিয়া ইয়াসমিন

আইডিঃ ২৩১০০১২১০৯৬

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

হিংসা বিদ্বেষ পতনের মূল....5

ইসলামের আলোচনায় একটি পার্থক্য করা হলো....7

হিংসার পরিণতি....9

প্রতিকার....10

হিংসা সম্পর্কিত তিনটি ঘটনায় তিন ধরনের শিক্ষা:....39

উপসংহারঃ....45

হিংসা বিদ্বেষ পতনের মূল

ভূমিকাঃ
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

হিংসা হলো অন্যের ক্ষতি করা, অন্যকে আঘাত করার মন মানসিকতা।
উদাহরণস্বরূপ:কাউকে মারধর করা, গালিগালাজ করা, আঘাত করা।
এছাড়াও কিছু বিষয় আছে যা আমরা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারি কিন্তু বাইরে বাহির থেকে বোঝা যায় না।
যেমন :

- কারো সফলতা দেখে মনে মনে কষ্ট অনুভব করা
- অন্যের সুখ দেখে কষ্ট পাওয়া।

হিংসা কেন হয়ঃ
হিংসা তখন সৃষ্টি হয় যখন আমরা অন্যের সৌন্দর্য সম্পদ সফলতা এবং আরো অন্যান্য দিক নিজেদের সাথে তুলনা করে থাকি। যখন তুলনা করে দেখি তাদের তুলনায় আমাদের কম তখন আমাদের অন্তরে হিংসার সৃষ্টি হয়।
কিছু সাধারণ বিষয়:
তুলনা করার প্রবণতা:
অন্যদের সাথে নিজেকে বারবার তুলনা করা
আত্মবিশ্বাসের অভাব :
নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে সচেতন না থাকা।
অপ্রাপ্তির অনুভূতি :
এখন যা চায় তা না পাওয়া
নিরাপত্তাহীনতা :
প্রিয় মানুষ মর্যাদা, সুযোগ ইত্যাদি হারানোর ভয়
স্বীকৃতির চাহিদা :
অন্যের চাহিদা দেখে মনে হওয়া নিজের চাহিদাগুলো স্বীকৃতি পাচ্ছিনা।

হিংসা মানুষের স্বাভাবিক মানবিক অনুভূতি। আর এর প্রভাব বেশি হলে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়, মানসিক অশান্তির সৃষ্টি হয়।

হিংসা কাদের প্রতি হয়

মূলত তাদের প্রতি হয় যাদের সাথে আমরা নিজেদের তুলনা করি।
উদাহরণস্বরূপ

- সহকর্মী
- আত্মীয়-স্বজন
- বন্ধুবান্ধব
- ভাই বোন
- প্রতিবেশী
- একই পেশার মানুষ

কথা হল দূরের মানুষের চেয়ে কাছের মানুষের প্রতিহিংসার প্রবণতা বেশি থাকে। কারণ তাদের সাফল্যে নিজের সাথে তুলনা করে থাকি।

তবে সবার ক্ষেত্রে এক হয় না। কেউ হিংসা করে সম্পদ দেখে, কেউ হিংসা করে সফলতা দেখে, কেউ হিংসা করে সৌন্দর্য দেখে।

কোরআনের দৃষ্টিতে হিংসা একটি নেতিবাচক গুণ।
বিশেষত যখন কেউ মনে করে নিজের কাছে থাকা নেয়ামত চলে যাক।

কুরআনের দৃষ্টিতে হিংসা

কুরআনের হিংসুকের হিংসা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার কথা উল্লেখ আছে। অন্যের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ দেখে হিংসা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

পরিবর্তে কি করা উচিত

- **আল্লাহর ফায়সালা সন্তুষ্ট থাকা**
- **উন্নতির চেষ্টা করা**
- **কল্যাণ ও সফলতার জন্য দোয়া করা**
- **নিজের প্রাপ্ত নেয়ামত সম্পর্কে কৃতজ্ঞ থাকা**

ইসলামের আলোচনায় একটি পার্থক্য করা হলো

হাসাদ

অন্যের ক্ষতি হোক এরকম কামনা করা।

গীবতাহ

অন্যের ভালো দেখে নিজের ভালো কামনা করা এবং অন্যের ক্ষতি না চাওয়া।

হিংসা মানুষের নেক আমল কে ধ্বংস করে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে বাধা প্রাপ্ত করে। সামগ্রিক শিক্ষা হল হিংসা মানুষকে কলুষিত করে, অন্তরকে নষ্ট করে।

কোরআনের আলোকে হিংসা (হাসাদ) ও বিদ্বেষ মানুষের অন্তরকে কলুষিত করে, সত্য গ্রহণে বাধা দেয় এবং ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্য ক্ষতিকর পরিণতি ডেকে আনে।

১. সত্য প্রত্যাখ্যানের কারণ হতে পারে
কোরআনে উল্লেখ আছে যে কিছু লোক আল্লাহর অনুগ্রহ অন্যদের ওপর দেখে হিংসা করত এবং সে কারণে সত্যকে অস্বীকার করত।
"তারা কি মানুষের প্রতি এজন্য হিংসা করে যে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে দান করেছেন?"

— Quran

২. শত্রুতা ও বিভেদ সৃষ্টি করে

হিংসা মানুষের মধ্যে ভালোবাসার পরিবর্তে বিদ্বেষ, বিরোধ ও সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। কোরআন মুমিনদেরকে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য বজায় রাখার নির্দেশ দেয়।

৩. অন্যায় ও পাপের দিকে ঠেলে দেয়

হিংসা থেকে মানুষ অপবাদ, অবিচার, ষড়যন্ত্র বা অন্যের ক্ষতি করার মতো কাজে জড়িয়ে পড়তে পারে। কোরআনে বহু জাতির অবাধ্যতার পেছনে পরস্পরের বিদ্বেষ ও হিংসার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. অন্তরের শান্তি নষ্ট করে

হিংসুক ব্যক্তি অন্যের সুখ-সাফল্য দেখে অশান্ত থাকে। কোরআন মানুষকে আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকতে এবং তাঁর অনুগ্রহ কামনা করতে শিক্ষা দেয়।

৫. আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় চরিত্রে পরিণত করে

কোরআনে হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে:

"আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।"

— Quran

এটি নির্দেশ করে যে হিংসা এমন একটি গুণ, যার ক্ষতিকর প্রভাব ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের ওপর পড়তে পারে।

কোরআনের শিক্ষা

কোরআন হিংসার পরিবর্তে:

আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা,

তাকওয়া (আল্লাহভীতি),

ধৈর্য,

ক্ষমাশীলতা,

এবং অন্যের কল্যাণ কামনার শিক্ষা দেয়।

সংক্ষেপে, কোরআনের আলোকে হিংসা ও বিদ্বেষের পরিণতি হলো অন্তরের অশান্তি, সম্পর্কের অবনতি, অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়া এবং সত্য থেকে দূরে সরে যাওয়া; আর এর প্রতিকার হলো কৃতজ্ঞতা, তাকওয়া ও উত্তম চরিত্র গঠন।

ইসলামী দৃষ্টিতে হিংসা (হাসাদ) অত্যন্ত ক্ষতিকর একটি মানসিক ও নৈতিক ব্যাধি। এর পরিণতি ব্যক্তি, সমাজ এবং আখিরাত—তিন ক্ষেত্রেই নেতিবাচক হতে পারে।

হিংসার পরিণতি

১. অন্তরের শান্তি নষ্ট হয় হিংসুক ব্যক্তি অন্যের সুখ-সাফল্য দেখে কষ্ট পায়। ফলে সে নিজেও মানসিক প্রশান্তি হারায়।

২. সম্পর্ক নষ্ট হয় হিংসা থেকে বিদ্বেষ, শত্রুতা, পরনিন্দা ও ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হয়। পরিবার, বন্ধু ও সমাজের মধ্যে দূরত্ব বাড়ে।

৩. অন্যায় ও গুনাহের দিকে নিয়ে যায় হিংসা মানুষকে মিথ্যা অপবাদ, ষড়যন্ত্র, অবিচার বা অন্যের ক্ষতি কামনার মতো কাজে প্ররোচিত করতে পারে।

৪. সত্য গ্রহণে বাধা দেয় কোরআনে দেখা যায়, অনেকেই হিংসা ও অহংকারের কারণে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

৫. নেক আমলের ক্ষতি ইসলামী শিক্ষায় হিংসাকে এমন একটি দোষ বলা হয়েছে যা মানুষের সৎকর্মের মূল্য নষ্ট করে দিতে পারে, যেমন আগুন কাঠকে পুড়িয়ে ফেলে।

৬. সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে হিংসা পারস্পরিক বিশ্বাস ও ভালোবাসা দুর্বল করে, ফলে সমাজে অশান্তি ও বিরোধ বৃদ্ধি পায়।

কোরআনের সতর্কবাণী

“আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।”

— Quran

এই আয়াত হিংসার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক করে এবং এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে শিক্ষা দেয়।

প্রতিকার

আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া।
অন্যের সাফল্যে খুশি হওয়ার চেষ্টা করা।
নিজের উন্নতির দিকে মনোযোগ দেওয়া।
আল্লাহর কাছে অন্তরের পবিত্রতা ও হিংসামুক্ত হৃদয়ের জন্য দোয়া করা।
সংক্ষেপে, হিংসার পরিণতি হলো অন্তরের অশান্তি, সম্পর্কের অবনতি, পাপের দিকে ঝুঁকে পড়া এবং আধ্যাত্মিক ক্ষতি; আর এর প্রতিকার হলো কৃতজ্ঞতা, সন্তুষ্টি ও তাকওয়া।

ভালোর প্রতি আগ্রহ ও টান, মন্দের প্রতি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা মানুষের স্বভাবজাত। কিন্তু মানুষ কখনো উল্টো পথে চলে; মন্দের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, মন্দের পেছনে ছোটে। ভালোর প্রতি অনীহা প্রদর্শন করে, ভালো থেকে দূরে থাকে। কিন্তু এটা মানুষের স্বভাবজাত নয় এবং তার সফলতার পথও নয়। স্বভাববিরুদ্ধ নিজের অকল্যাণের পথ থেকে ফেরাতে আল্লাহ বহুভাবে তাঁর বান্দাদের উৎসাহিত করেছেন। পুরস্কার ও পরিণাম তুলে ধরেছেন।

এ অবস্থার কেন্দ্র যেহেতু নফস ও আত্মা, তাই আল্লাহ তাআলা এ নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে বলেছেন- ভালো পথে পরিচালিত করতে বলেছেন, মন্দ পথ থেকে ফেরাতে বলেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন:

অবশ্যই সে সফল হয়েছে, যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে। আর সে ব্যর্থ হয়েছে, যে তা বিনষ্ট করেছে। -সূরা শামস (৯১) : ৯-১০

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰي

নিশ্চয়ই সফল সে ,সফল হয়েছে যে পরিশুদ্ধ হয়েছে। -সূরা আ'লা (৮৭) : ১৪
যেসকল মন্দ চরিত্র ও স্বভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ হল হাসাদ-হিংসা। আসুন আমরা আমাদের আত্মাকে হিংসা থেকে পরিশুদ্ধ করি। জেনে নিই এর উৎস, ক্ষতি ও প্রতিকার।

হিংসা তৈরি হয় দৃষ্টির অপব্যবহার ও দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা থেকে। একটু ব্যাখ্যা করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে।

আল্লাহ তাআলা হলেন রাযযাক- মহা রিযিকদাতা। তিনি হাকীমও-প্রাজ্ঞ হেকমতওয়ালা। কাউকে ধনী বানান, কাউকে দরিদ্র। এই শ্রেণিভেদ তাঁর হিকমাহ ও প্রজ্ঞারই অংশ। এরই ওসিলায় সচল থাকে জীবনের চাকা। বান্দার কাজ হল, আল্লাহর বণ্টনের প্রতি রাজি থাকা- শোকর ও সবরের মাধ্যমে। আমরা যেন অকৃতজ্ঞ ও অধৈর্য না হই, তাই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শিখিয়েছেন- পার্থিব বিষয়ে যেন নিজের চেয়ে নিচের ব্যক্তির দিকে তাকাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ.

তোমাদের চেয়ে যে উপরের অবস্থানে আছে তার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে যে নিচের অবস্থানে আছে তার প্রতি দৃষ্টি দাও। তাহলে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্-প্রদত্ত নিআমত ও অনুগ্রহকে তুচ্ছ মনে হবে না। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৫১৩

নবীজীর এই নির্দেশনা অনুযায়ী যে চলে তার জীবন হয় কৃতজ্ঞতা ও সবরের, উদারতা ও মহানুভবতার। কিন্তু যখনই কেউ এই নির্দেশনাটি অমান্য করে; বঞ্চিত হয় শোকর ও সবরের অমূল্য সম্পদ থেকে, আক্রান্ত হয় হিংসার মত ভয়াবহ মরণব্যাধিতে।

ক্ষতি

হিংসা দ্বারা না হিংসুকের রিযিক বাড়ে আর না যার প্রতি হিংসা করা হয় তার রিযিক কমে। অধিকন্তু এতে হিংসুকের জন্য রয়েছে সমূহ ক্ষতি। যেমন :

১. হিংসা অভিশপ্ত ইহুদী জাতির স্বভাব

কুরআন কারীমে যত জায়গায় হিংসার আলোচনা রয়েছে অধিকাংশই ইহুদী জাতির দুষ্কৃতির ফিরিস্তি।উদাহরণস্বরূপ সূরা বাকারা ৯০, ১০৯। সূরা আলে ইমরান ১৯। সূরা নিসা ৫৪ ও সূরা ফালাকের ৫ নং আয়াত। মূলত এই হিংসা ও হঠকারিতাই ওদের গলায় অভিশাপের বেড়ি পরিয়েছে।

২. হিংসা অন্তর্জগতে অস্থিরতা সৃষ্টি করে

হিংসুকের অন্তর আমরণ অস্থিরতায় ভোগে। কারণ হিংসা আগুন। হিংসুক যখন অন্যের উন্নতি সহ্য করতে পারে না; হিংসার আগুনে নিজেই জ্বলে মরে।

৩. হিংসা নেকী ধ্বংস করে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إياكُم والحَسَدَ، فإِنَّ الحَسَدَ يأكُلُ الحَسَناتِ كما تأكُلُ النَارُ الحَطَبَ.

হিংসা থেকে সাবধান! কেননা হিংসা নেকীকে এমনভাবে ধ্বংস করে; যেমন আগুন লাকড়ি ধ্বংস করে। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯০৩

৪. হিংসা বহু হারাম কাজের দরজা খুলে দেয়

অন্তর যখন হিংসায় আক্রান্ত হয়; হাত-পা, মুখ-মাথা ইত্যাদি অঙ্গগুলোও এর থেকে রেহাই পায় না। মাথায় অন্যের ক্ষতিসাধনের চিন্তা, চোখে দোষ খোঁজা, মুখে দোষ চর্চা ও নিন্দা এবং হাত-পা ও মুখ দ্বারা জান, মাল ও ইজ্জত আব্রুতে আঘাত করা যেন হিংসুকের যথারীতি অভ্যাসে পরিণত হয় ।হায়, এক হিংসা কতগুলো হারাম কাজের দরজা খুলে দেয়!

৫. হিংসা ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে

হিংসার সবচেয়ে বড় ক্ষতি হল. এটি ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কারণ ঈমানের দাবি হল, আল্লাহ তাআলাকে রব বলে স্বীকার করা এবং তাঁর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা। হিংসার সারকথা হল, আল্লাহর ফয়সালা ও বণ্টনের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা। বান্দার এ অবস্থা যে তার ঈমানকে মারাত্মকরূপে ক্ষতিগ্রস্ত করে তা বলাই বাহুল্য। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

... وَلَا يَجتَمِعُ فِي جَوفِ عَبْدٍ الإِيْمَانُ وَالحَسَدُ.

...কারো অন্তরে ঈমান ও হিংসা একত্র হতে পারে না। -সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৪৬০৬

হিংসা দমনের পদ্ধতি

১. কারো প্রতি হিংসা অনুভব হওয়া মাত্রই দুটি কথা চিন্তা করা :ক. এই হিংসা দ্বারা না আমার রিযিক বাড়বে আর না যার প্রতি হিংসা করছি তার রিযিক কমবে। উপরন্তু এর কারণে আমার ঈমান আমল ক্ষতিগ্রস্ত হবে, দুনিয়া ও আখেরাত বরবাদ হবে।

খ. আমার কল্যাণ-অকল্যাণ আমার চেয়ে আমার আল্লাহ্ই ভালো জানেন। সুতরাং আমার নসীবে তিনি যা দিয়েছেন তা-ই আমার জন্য কল্যাণকরা। তাতেই আমার তুষ্ট থাকা উচিত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

عَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ عَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَ اللهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

হতে পারে, তোমরা একটি জিনিস অপছন্দ কর; অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং একটি জিনিস পছন্দ কর; অথচ তা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না। -সূরা বাকারা (২) : ২১৬

২. অর্থের প্রতি খেয়াল করে এই আয়াত তিলাওয়াত করা-

وَ لَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ، لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، وَ سْـَٔلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهٖ، اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا.

তোমরা এমন জিনিসের বাসনা করো না, যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের একজনকে অন্য জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষদের জন্য রয়েছে তাদের উপার্জনের অংশ আর নারীদের জন্য রয়েছে তাঁদের উপার্জনের অংশ। আর তোমরা আল্লাহর নিকট তাঁর দয়া প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে সম্যক অবগত। -সূরা নিসা (৪) : ৩২

৩. আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের এবং যার প্রতি হিংসা অনুভব হয় তার জন্য কল্যাণের দুআ করা। সাথে সাথে হিংসা থেকে আরোগ্যের জন্যও দুআ করা।

৪. হিংসার চাহিদার বিপরীত কাজ করা। যেমন নিন্দার পরিবর্তে প্রশংসা করা। ক্ষতি না করে উপকার করা। দোষ না খুঁজে গুণ খোঁজা।তার সাথে ঐ সকল কাজ করা, যেগুলো দ্বারা পারস্পরিক হৃদ্যতা ও ভালবাসা তৈরি হয়; যথা সালাম দেওয়া, হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা, মাঝেমধ্যে হাদিয়া দেওয়া ইত্যাদি। এ বিষয়ে হাকীমুল উম্মত থানভী রাহ. লেখেন-যার প্রতি হিংসা হয় মানুষের নিকট তার প্রশংসা করা, সামনে পড়লে তার তাযীম করা এবং মাঝে মাঝে তার কাছে হাদিয়া পাঠানো... এ এমন এক এলাজ, যা বিশেষ এলাজসমূহের চেয়ে দ্রুত ও সহজলভ্য।... -(আশরাফ চরিত, ৩৫৫)এগুলো করতে বেশ কষ্ট হবে। কিন্তু এই কষ্ট তো আমার ঈমান-আমল রক্ষার জন্য, আমার চিরস্থায়ী শান্তির জন্য। এ তো রহমতের বারিধারা বর্ষণের পূর্বে ধুলোবালি ওড়া, ঘন কালো মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও মেঘগর্জন।অতএব আসুন আমরা হিংসা দমন করি। হিংসার আগুন আর আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা করি নিজেকে। শান্তিময় জীবনের অধিকারী হই। প্রতিজ্ঞা করি, আমাকে বাঁচতেই হবে এ মরণব্যাধি থেকে।

মানবেতিহাসের শুরুর দিককার কথা। পৃথিবীতে মানব পরিবার বলতে তখনো কেবলই হযরত আদম আলাইহিস সালামের পরিবার। হযরত হাওয়া রা.-এর সঙ্গে তাঁর সংসার। তাঁদের সন্তান জন্ম নিত জোড়ায় জোড়ায় এক ছেলে এক মেয়ে। তাদের জন্যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশেষ নিয়ম ছিল এমন জমজ ভাইবোন পরস্পর বিয়ে করতে পারবে না। যাদের জন্ম আগে-পরে, তারা একে অন্যকে বিয়ে করতে পারবে। হযরত আদম আলাইহিস সালামের দুই ছেলের নাম ছিল হাবীল ও কাবীল। কাবীলের সঙ্গে যে বোনের জন্ম হয় সে ছিল অধিক সুশ্রী। তাই নিয়ম ভেঙ্গে কাবীল তাকেই বিয়ে করতে চায়। আর নিয়ম টিকিয়ে তাকে বিয়ে করতে আগ্রহী ছিল হাবীলও। দ্বন্দ্ব নিরসনে তাদেরকে কুরবানী করতে বলা হল। যার কুরবানী কবুল হবে সে-ই তার উক্ত বোনকে বিয়ে করতে পারবে। এর পরের কাহিনী পবিত্র কুরআনের ভাষায়Ñ

اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ لَىِٕنْ بَسَطْتَّ اِلَیَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِیْ مَاۤ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِیَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ اِنِّیْۤ اَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ...

যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল, কিন্তু তাদের একজনের পক্ষ থেকে তা কবুল করা হল এবং অপরজনের পক্ষ থেকে কবুল করা হয়নি। সে বলল, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। অপরজন বলল, আল্লাহ তো মুত্তাকীদের থেকেই কবুল করে থাকেন। তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্যে আমার দিকে তোমার হাত বাড়িয়ে দাও, তবুও আমি তোমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তোমার দিকে আমার হাত বাড়াব না। আমি অবশ্যই বিশ্বজগতের প্রভু আল্লাহকে ভয় করি। অবশ্যই আমি চাই, তুমি আমার পাপ এবং তোমার পাপ বহন কর, এরপর তুমি দোজখিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। আর এটাই জালেমদের শাস্তি। অবশেষে তার মন তাকে ভাই-হত্যার বিষয়ে প্ররোচিত করল, এরপর সে তাকে হত্যা করল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। সূরা মায়িদা (৫) : ২৭-৩০

পবিত্র কুরআনের বর্ণনানুসারে, এই হচ্ছে পৃথিবীতে সংঘটিত প্রথম হত্যাকা-। পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম অপরাধ। প্রথম এই হত্যাকা-ের পেছনের কারণও আমরা উপরোক্ত আয়াতসমূহে দেখতে পাই, ‘তোমার কুরবানী কবুল হয়েছে আর আমারটি হয়নি’এই চিন্তা থেকেই কাবীলের মনে হিংসা জমাট বাঁধতে থাকে আর এর পরিণতিতেই সে তার ভাই হাবীলকে হত্যা করে। যে হিংসা মানুষকে দিয়ে পৃথিবীতে পাপের সূচনা করাল, সে-ই হিংসা জগতে আরও কত শত-সহস্র অনিষ্ট ঘটিয়েছে তার হিসাব কে জানে!

ইতিহাসের আরও পেছনের পাতায় আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ইবলিসের যে ঔদ্ধত্য ও অহংকারের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, উল্লেখিত হয়েছে তার অভিশপ্ত হওয়ার কথা, তার মূলেও তো একই হিংসা। কুরআনের ভাষায়

قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ.

সে বলল, দেখুন তো, এই কি সেই সৃষ্টি, যাকে আপনি আমার ওপর মর্যাদা দান করেছেন? সূরা ইসরা (১৭) : ৬২

ফলাফল তো এই আকাশের প্রথম অপরাধ আর জমিনের প্রথম অপরাধ সবটার মূলেই এই হিংসা। এর জঘন্যতা তাই আর বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রশ্ন হল, হিংসা কী?-হিংসা হচ্ছে অন্যের ভালো কোনো কিছু দেখে তা ধ্বংস হওয়া বা হারিয়ে যাওয়ার কামনা করা। কেউ ভালো পথে চলতে থাকলে কিংবা ভালো কোনো কাজ করতে গেলে সেখান থেকে সে ফিরে আসা, বাধাগ্রস্ত হওয়া কিংবা ব্যর্থ হওয়ার কামনা করা। এগুলোই হিংসা। এসব হচ্ছে হিংসার প্রথম ধাপ। এর একটা পর্যায় অবশ্য মানুষের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। অনেকটাই সৃষ্টিগত ও স্বভাবজাত। আল্লাহ তাআলা তো বলেই দিয়েছেন

وَ اُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ.

মানুষকে কৃপণতাপ্রবণ করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। সূরা নিসা (৪) : ১২৮—এ কৃপণতার প্রভাবে মানুষ যেমন অন্য কাউকে নিজের সম্পদ দিতে চায় না, ঠিক এ কার্পণ্যের কারণেই 'অন্য কেউ ভালো অবস্থায় থাকুক'এটা সে মেনে নিতে চায় না। মানুষের একটি স্বাভাবিক স্বভাব হচ্ছে, সে অবচেতনভাবেই কামনা করে সকল ভালো জিনিস তার কাছে এসে একত্রিত হোক, যাবতীয় অর্থ সম্মান প্রভাব-প্রতিপত্তি তার হাতে চলে আসুক ইত্যাদি। এ কামনার জন্যেই তো তার চাহিদা সবসময় ঊর্ধ্বমুখী। চাওয়া শেষ হয় না কখনো। এক চাহিদা পূর্ণ হল তো আরেক চাহিদা এসে হাজির। এক লক্ষ্য অর্জিত হল তো আরেক লক্ষ্যের পেছনে অবিরাম ছুটে চলা। এটা স্বাভাবিকতা। এখান থেকেই জন্ম নিয়ে থাকে হিংসা এ সম্মান কিংবা এ পদ অথবা এত এত অর্থ আমার কাছে না এসে তার কাছে কেন? তা আমার কাছে চলে আসুক। তা যদি না হয় কমপক্ষে তার কাছ থেকে হারিয়ে যাক। এটাই হিংসা।

পবিত্র কুরআনের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে বনী ইসরাঈল তথা ইহুদী-খ্রিস্টানদের আলোচনা। জাতি হিসেবে তাদের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ। তাদেরকে আল্লাহ তাআলা দান করেছিলেন অজ ্র বড় বড় নিআমত। আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস

সালামের পবিত্র কাফেলার প্রায় সকলেই ছিলেন বনী ইসরাঈল গোত্রভুক্ত। তাদেরকে দেয়া হয়েছিল আসমানী অনেক কিতাব। কিন্তু এতকিছু পেয়েও তারা শোকরগুজার ছিল না। ছিল না আল্লাহ তাআলার হুকুমের পূর্ণ অনুগত। তাঁর বিধান তারা লঙ্ঘন করেছে। আসমানী কিতাবে হয়ত বিকৃতি ঘটিয়েছে, কিংবা তার ওপর আমল করা ছেড়ে দিয়েছে। নবীদেরকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছে। এমনকি তাদের হাতে প্রাণও গেছে অনেক নবীর। পরিণামে তারা আমাদের কাছে আজ আলোচিত অভিশপ্ত এবং আল্লাহর গজবে নিপতিত জাতি হিসেবে। তাদের কিতাবসমূহে শেষ নবীর কথা ছিল। তাঁর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের বিবরণ ছিল। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা যখন শেষ নবী হিসেবে পাঠালেন, তখন তারা তাঁকে চিনতেও পারল। সে চেনাও কেমন? পবিত্র কুরআনের বর্ণনানুসারে নিজের ছেলেসন্তানকে মানুষ যতটুকু শক্তির সঙ্গে চেনে, তাদের চেনা ছিল আরও গভীর, আরও শক্তিমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেবলই ইসরাঈলী না হওয়ার কারণে তারা একদিকে তাঁর নবুওত মেনে নিতে অস্বীকার করে। উপরন্তু যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী হিসেবে মেনে নিয়েছে, তারা যেন এ সঠিক ও সরল পথ ছেড়ে আগের ভ্রান্ত ও বাঁকা পথে ফিরে যায় তারা সে কামনাও করত। এর মূলে ছিল কেবলই হিংসা সঠিক দ্বীন আমরা মানি না তো তারা মানবে কেন? পবিত্র কুরআনের ভাষায়

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا   حَسَدً مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ.

আহলে কিতাবদের অনেকেই তাদের নিকট সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও হিংসাবশত কামনা করে তোমাদের ঈমান আনার পরও যদি তারা তোমাদের কাফের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে পারত! সূরা বাকারা (২) : ১০৯—আরেকজনের কোনো নিআমত দেখে তা বিলুপ্তির কামনা করা হিংসার প্রথম ধাপ। এর পরের ধাপ হচ্ছে, মনে যখন কারও প্রতি হিংসা জন্ম নেয় তখন এর চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা। তা হতে পারে তার কোনো ক্ষতি করার মধ্য দিয়ে, হতে পারে তার কোনো ক্ষতিতে আনন্দ প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এসব যেহেতু তার কর্ম। তাই এর কারণে সে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। জবাবদিহিতার মুখোমুখি হবে তখনো, যদি সে তার হিংসার কথা মুখে প্রকাশ করে ফেলে। যতটুকু মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃতভাবে কারো প্রতি হিংসার ভাব উদ্রেক হওয়া তাতে গোনাহ হবে না।তবে গোনাহ হোক আর নাই হোক, হিংসা

অবশ্যই মানবচরিত্রের একটি মন্দ দিক। মনের হিংসার দাবিতে কেউ যদি অন্যায় আচরণ করে, ক্ষতি করার সুযোগ খোঁজে তাহলে তা যে নিন্দনীয় তা কে অস্বীকার করবে! হিংসা যে মানুষকে অন্যায়ে উৎসাহিত করে তাও জানা কথা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিখিয়েছেন হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ.

এবং (আমি আশ্রয় চাই) হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে। সূরা ফালাক (১১৩) : ৫

আর যদি বিষয়টি এ পর্যায়ে না গড়ায়, হিংসা কারও মনের গভীরেই লালিত হতে থাকে, তাহলে তাও নিন্দনীয়। আরবী ভাষার উক্তি

الحاسد يحترق بنار الحسد.

অর্থাৎ হিংসুক হিংসার আগুনে জ্বলে। কারণ হিংসা কারও কোনো ক্ষতি করতে পারে না। যাকে এগিয়ে যেতে দেখে কেউ হিংসা করছে, সে তো এগিয়েই যায়। হিংসা তার এগিয়ে চলার গতি রোধ করতে পারে না। কারও মনে সৃষ্ট হিংসা যদি অন্য কারও নিআমতকে বিনাশ করতে পারত, তাহলে তো জগতের কেউই ভালো কিছু হাছিল করতে পারত না। দাঁড়াতে পারত না কারও সম্মান প্রতিপত্তি সুনাম যশ খ্যাতি সুসন্তান অর্থ বিদ্যাবুদ্ধি দ্বীনদারী পরহেজগারি কিছুই। কথায় বলে না শকুনের দুআয় গরু মরে না! আত্মচিন্তায় বিভোর শকুনের কামনা যেমন গরুর মৃত্যু ডেকে আনে না, তেমনি হিংসুকের হিংসাও কারও নিআমত ছিনিয়ে নিতে পারে না। হিংসাকে অগ্রাহ্য করে প্রতিনিয়ত যখন কেউ এগিয়ে চলে তখন বাড়তে থাকে হিংসার আগুন। সে আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হতে থাকে হিংসুকের অন্তর। কথা হল, হিংসার আগুন কি শুধু হিংসুকের অন্তরকেই জ্বালায়? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস থেকে আমরা এর উত্তর পাই

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ أَوْ قَالَ الْعُشْبَ.

তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থেকো। কারণ হিংসা নেক আমলসমূহকে গ্রাস করে নেয়, যেভাবে আগুন গ্রাস করে লাকড়ি (অথবা ঘাস)। সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯০৫

শুকনো ঘাস আর লাকড়ি যেমন আগুনের সামনে অসহায়, হিংসার আগুনের সামনে মানুষের নেক আমলও তেমনি অসহায়। হিংসার আগুন গ্রাস করে নেয় ব্যক্তির যাবতীয় নেক আমল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেক হাদীসে হিংসাকে তুলনা

করেছেন পানির সঙ্গে। দুই হাদীসের দুই উপমা বাহ্যত বিপরীতমুখী মনে হলেও এ বিবেচনায় তো অবশ্যই এক আগুন যেমন লাকড়ি আর ঘাসকে জ্বালিয়ে শেষ করে দেয়, পানিও তেমনি আগুনকে নিভিয়ে দেয় মুহূর্তেই। আগুনের সামনে লাকড়ি আর ঘাসের প্রাচুর্য যেমন কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়, পানির সামনেও আগুনের বিশালতা উল্লেখ করার মতো কিছু নয়। হাদীসের ভাষ্য এমন

إِنّ الْحَسَدَ يُطْفِئُ نُورَ الْحَسَنَاتِ.

সন্দেহ নেই, হিংসা নেক আমলসমূহের নূর ও আলোকে নিভিয়ে দেয়। সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯০৬

হিংসা তাই সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য। এ হিংসা কোনো মুমিনের চরিত্র হতে পারে না। হাদীসের বক্তব্য এমনই

لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ.

কোনো বান্দার হৃদয়ে ঈমান ও হিংসা একত্রিত হতে পারে না। সুনানে নাসাঈ, হাদীস ৩১০৯

অবশ্য হিংসার একটি রূপ এমনও, যেখানে কারও অমঙ্গল কামনা নেই। কারও ভালো কোনো কিছু দেখে তার বিনাশ নয়, বরং নিজের জন্যেও অর্জিত হোক অনুরূপ ভালো ও কল্যাণ এই কামনা রয়েছে সেখানে। প্রথমটিকে আরবীতে বলে 'হাসাদ' আর পরেরটিকে বলা হয় 'গিব্তা', বাংলায় যাকে আমরা বলি 'ঈর্ষা'। এই ঈর্ষা দোষণীয় কিছু তো নয়ই, বরং ক্ষেত্রবিশেষে প্রশংসনীয়ও। ঈর্ষা অনেক সময় আমলের আগ্রহ সৃষ্টি করে। নেক কাজে উদ্বুদ্ধ করে। ভালো কাজে ও কল্যাণকর ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে। মুমিন বান্দা যখন কাউকে বারবার হজ্ব-উমরা পালন করতে দেখে কিংবা অল্প বয়সে কাউকে বায়তুল্লাহ যিয়ারতের সৌভাগ্য হাসিল করতে দেখে, সে তখন আবেগে আপ্লুত হয়, তার মনে ঈর্ষা জন্ম নেয়Ñএ সৌভাগ্য যদি আমারও হাসিল হতো! এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনÑ

لاَ حَسَدَ إِلاَ عَلَى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْكِتَابَ وَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللّيْلِ وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ مَالاً فَهْوَ يَتَصَدّقُ بِهِ آنَاءَ اللّيْلِ وَالنّهَارِ.

হিংসা (অর্থাৎ ঈর্ষা) কেবল দুই ব্যক্তিকেই করা যায়Ñআল্লাহ যাকে কুরআন হিফজ করিয়েছেন আর সে রাতের বিভিন্ন প্রহরে নামাযে দাঁড়িয়ে তা তিলাওয়াত করে, আর যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন এবং সে তা দিনে-রাতে দান করে। Ñসহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৫

কথা হল, এ ঈর্ষাকে তো আমরা প্রশংসিত হিংসাও বলতে পারি। কিন্তু যে হিংসা নিন্দনীয়, যে হিংসা তিলে তিলে ধ্বংস করে দেয় আমাদের যাবতীয় অর্জন, আগুনের মতোই গ্রাস করে নেয় আমাদের নেক আমল, যা পানির মতো নিভিয়ে দেয় ঈমান ও আমলের নূর, কারও মনে যখন তা দেখা দেবে তখন তা প্রতিহত করার উপায় কী? অন্য সকল ক্ষেত্রের মতো এখানেও প্রিয় নবীজীর প্রিয় কথামালাই তো আমাদের জন্যে চূড়ান্ত নির্দেশনা। এক হাদীসে তিনি বলেছেনÑ

...دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمْ :الحَسَدُ وَالبَغْضَاءُ

পূর্ববর্তী জাতিসমূহের রোগব্যাধি তোমাদের কাছেও এসে পৌঁছেছে। তা হল হিংসা-বিদ্বেষ। এটা মু-িয়ে দেয়। আমি চুল মু-ানোর কথা বলছি না। বরং তা দ্বীনকে মু-িয়ে দেয়। যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, যতক্ষণ তোমরা ঈমান না আনবে ততক্ষণ জান্নাতে যেতে পারবে না। আর যতক্ষণ পরস্পরে ভালোবাসা সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ তোমাদের ঈমানও পূর্ণ হবে না। আমি তোমাদের বলে দিইÑকীসের মাধ্যমে তা অর্জিত হবে? তোমরা তোমাদের মাঝে সালামের প্রসার ঘটাও। Ñজামে তিরমিযী, হাদীস ২৫১০
আরেকটি হাদীসে তাঁর নির্দেশনা এমনÑ

.لاَ تَقَاطَعُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا

তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না, একে অন্যের পেছনে লেগে থেকো না, একে অন্যের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না। বরং তোমরা আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও, পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে যাও। Ñজামে তিরমিযী, হাদীস ১৯৩৫
হাদীস দুটির বক্তব্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই। হিংসা-বিদ্বেষ মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে, সৃষ্টি করে দূরত্ব ও শত্রুতা।
উল্লেখিত দ্বিতীয় হাদীসে যেমন এসবকে দূরে ঠেলে দিয়ে পরস্পর মিলেমিশে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজ গঠনের নির্দেশনা রয়েছে, প্রথম হাদীসে তেমনি এ ভ্রাতৃত্ববোধকে জাগ্রত করা এবং সর্বদাই একে সজাগ ও সচেতন রাখার জন্যে বেশি বেশি সালামের কথাও বলা হয়েছে। সালামের প্রচলন যখন বেশি হবে পারস্পরিক হৃদ্যতা ও ভালোবাসা তখন সৃষ্টি হবেই। আর হৃদয় দিয়ে যখন কেউ কাউকে ভালোবাসতে পারবে, তখন আর তার ভালো কোনো কিছু দেখে সে কুণ্ঠিত হবে না, তার মনে হিংসা দানা বাঁধবে না, বন্ধুর ভালো জিনিসটির বিনাশ কামনা করবে না। তাই কারও প্রতি যদি মনে হিংসা জন্ম নেয় বিশেষভাবে তার সঙ্গে যদি সালাম-কালাম বাড়িয়ে দেয়া যায়, মহব্বত সৃষ্টির লক্ষ্যে তাকে কিছু হাদিয়া দেয়া যায় তাহলে তা হিংসার ঘায়ে মলমের মতো কাজ করতে

পারে। মনকে হিংসামুক্ত রাখার জন্যে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ দুআটিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্যÑ

رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِى وَاغْسِلْ حَوْبَتِى وَأَجِبْ دَعْوَتِى وَثَبِّتْ حُجَّتِى وَاهْدِقَلْبِى وَسَدِّدْ لِسَانِى وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِى.

প্রভু আমার! আপনি আমার তওবা কবুল করুন, আমার পাপরাশি ধুয়ে দিন, আমার ডাকে সাড়া দিন, আমার দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করুন, আমার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আমার যবানকে সঠিক রাখুন আর আপনি আমার অন্তরের যাবতীয় কলুষতা দূর করে দিন। Ñসুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৫১২

হম

উ

- প্রশ্

- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وس قَا

-لاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ تَقَاطَعُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، رواه البخاري :

অনুবাদ : হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, তোমরা পরস্পরে বিদ্বেষ করো না, হিংসা করো না, ষড়যন্ত্র করো না ও সম্পর্ক ছিন্ন করো না। তোমরা পরস্পরে আল্লাহর বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে যাও’।[1]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীছে মানবতাকে হত্যাকারী কয়েকটি দুরারোগ্য ব্যাধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইসলামী সমাজকে ভিতর থেকে ধ্বংস করে দেয়। এখানে চারটি বিষয় উল্লেখ করা হলেও তা মূলতঃ একটি থেকে উৎসারিত। আর তা হ’ল ‘হিংসা’। এই মূল বিষবৃক্ষ থেকেই বাকীগুলি কাঁটাযুক্ত ও যন্ত্রণাদায়ক ডাল-পালার ন্যায় বেরিয়ে আসে।

হিংসা অর্থأَنْ يَحْسُدَ عَلَى ما أنعَمَ اللهُ عليه به، وأن يتمني زَوَالَ نِعْمَتِهِ ‘আল্লাহ অন্যকে যে নে‘মত দান করেছেন তাকে হিংসা করা এবং উক্ত নে‘মতের ধ্বংস কামনা করা’। আর হিংসুক হ’ল, **الحريص علي زوالِ النِّعْمَةِ علي الْمَحْسُود** ‘হিংসাকৃত ব্যক্তির নে‘মত ধ্বংসের আকাংখী’। হিংসার পিছে পিছে আসে বিদ্বেষ। সে তখন সর্বদা ঐ ব্যক্তির মন্দ কামনা করে। যেমন মুমিনদের বিরুদ্ধে মুনাফিকদের আচরণ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوْا بِهَا ‘যদি তোমাদের কোন কল্যাণ স্পর্শ করে, তাতে তারা অসন্তুষ্ট হয়। আর যদি তোমাদের কোন অকল্যাণ হয়, তাতে তারা আনন্দিত হয়’ *(আলে ইমরান ৩/১২০)*। বস্ত্ততঃ এ দু’টি বদস্বভাবের মধ্যে ঈমানের

কোন অংশ নেই। কেননা মুমিন সর্বদা অন্যের শুভ কামনা করে। যেমন সে সর্বদা নিজের শুভ কামনা করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ‘তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য ঐ বস্ত ভালবাসবে, যা সে নিজের জন্য ভালবাসে’।[2] যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করে, তার ঈমান হয় ত্রুটিপূর্ণ। হিংসা তার সমস্ত নেকীকে খেয়ে ফেলে যেমন আগুন ধীরে ধীরে কাঠকে খেয়ে ফেলে। এভাবে সে নিজের আগুনে নিজে জ্বলে মরে। পরিণামে তার পূর্বে কৃত সৎকর্ম সমূহের নেকীগুলিও ক্রমে নিঃশেষ হয়ে যায়। ঐ অবস্থায় তার মৃত্যু হ’লে সে নিঃস্ব অবস্থায় আল্লাহর কাছে চলে যায়।

অতএব একজন মুসলিমের কর্তব্য হ’ল সর্বদা সাদা মনের অধিকারী থাকা। তার অন্তরে যেন কারু প্রতি হিংসার কালিমা না থাকে। যদি কোন কারণ বশতঃ সেটা কখনো এসেই যায়, তবে বুদ্বুদের মত যেন তা উবে যায়। কচুর পাতার পানির মত যেন তা ঝরে যায়। হৃদয় যেন সকলের প্রতি উদার থাকে এবং শত্রু-মিত্র সকলের প্রতি হেদায়াতের আকাংখী থাকে। এমন অবস্থায় নিদ্রা যাবে, যেন তার হৃদয়ের কোণে কারু প্রতি হিংসার কালো মেঘ জমে না থাকে। কেননা এই নিদ্রা তার চিরনিদ্রা হ’তে পারে। ভালোবাসা ও বিদ্বেষের মানদন্ড হবে কেবল ঈমান। আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও আল্লাহর জন্য বিদ্বেষ এটিই হল মানদন্ড। কোন মুমিন কোন কাফিরকে কখনোই উদারভাবে ভালবাসতে পারে না। কেননা কাফিরের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। তাকে ভালোবাসার মধ্যে আখেরাতে কিছুই পাবার নেই। এক্ষেত্রে কাফিরকে তার কুফর থেকে ঈমানের দিকে ফিরানোর সাধ্যমত চেষ্টা করাই হবে তার প্রতি ভালবাসার সঠিক নমুনা। এটা না করলে মুমিন গোনাহগার হবে ও আল্লাহর নিকট কৈফিয়তের সম্মুখীন হবে। কেননা মুমিন ও কাফির উভয়ে একই পিতা আদমের সন্তান। আদম (আঃ) মুসলিম ছিলেন। তাই উভয়ে বংশসূত্রে মুসলিম। কিন্তু না বুঝে অথবা বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে যদি কেউ কাফির-মুশরিক হয়ে থাকে, তবে তাকে বুঝিয়ে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনা মুমিনের অবশ্য কর্তব্য। যেসব মুসলিমের পিতা-মাতা কাফির বা মুশরিক অবস্থায় মারা গেছেন, তারা সর্বদা জাহান্নামের আগুনে জ্বলছেন, এ দৃশ্য চিন্তা করে কোন মুসলিম সন্তান স্থির থাকতে পারেন কি? একইভাবে মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও যারা শিরক ও বিদ‘আতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের পরিণামও জাহান্নাম। তাদের নিকটাত্মীয়রা কি তাদের জীবন্ত আগুনে পোড়ার জ্বলন্ত দৃশ্য মনের আয়নায় দেখে সহ্য করতে পারবেন? তাই কাফির-মুশরিক, মুনাফিক ও ফাসিকদের প্রতি

বিদ্বেষ-এর অর্থ হ'ল তাদের অবিশ্বাস ও অপকর্মকে ঘৃণা করা ও নিজেকে তা থেকে বাঁচিয়ে রাখা। তবে সকল আদম সন্তানের হেদায়াতের জন্য নিজের হৃদয়কে সদা উন্মুক্ত ও বিদ্বেষ মুক্ত রাখাটাই হ'ল প্রকৃত মুমিনের নিদর্শন।

হিংসা ও বিদ্বেষ হ'ল অন্তরের বিষয়। কিন্তু তার বিষফল হিসাবে ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত ও সম্পর্কচ্ছেদ ইত্যাদি হ'ল কর্মের বিষয়। তাই অন্তর বিদ্বেষমুক্ত না হ'লে কর্ম অন্যায়মুক্ত হয় না। যদি কোন মুমিন পাপকর্ম করে, তাহ'লে তার পাপকে ঘৃণা করবে। কিন্তু ঈমানের কারণে তাকে ভালবাসবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ 'নিশ্চয়ই মুমিনগণ সকলে ভাই ভাই' (হুজুরাত ৪৯/১০)। আর ভাইয়ের প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসা তখনই বুঝা যাবে, যখন তার পাপের কারণে তাকে ঘৃণা করা হবে। তাতে সে তওবা করে ফিরে আসতে পারে। নইলে পাপী হওয়া সত্ত্বেও তাকে ভালবাসলে সে কখনোই তওবা করবে না এবং পাপ ও পুণ্যে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। বরং প্রকৃত ঈমানের নিদর্শন হ'ল ফাসেক-মুনাফিকদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা এবং সত্যের পক্ষে সমর্থন ও মিথ্যার বিপক্ষে ক্রোধ প্রকাশ করা। যেমন হযরত আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيْمَانَ 'যে আল্লাহর জন্য অপরকে ভালবাসে ও আল্লাহর জন্য বিদ্বেষ করে, আল্লাহর জন্য দান করে ও আল্লাহর জন্য বিরত থাকে, সে তার ঈমানকে পূর্ণ করল'।[3] একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল শ্রেষ্ঠ মানুষ কে? তিনি বললেন, كُلُّ مَخْمُوْمِ الْقَلْبِ صَدُوْقِ اللِّسَانِ 'প্রত্যেক শুদ্ধহৃদয় ও সত্যভাষী ব্যক্তি'। লোকেরা বলল, সত্যভাষীকে আমরা চিনতে পারি। কিন্তু শুদ্ধহৃদয় ব্যক্তিকে আমরা কিভাবে চিনব? জবাবে তিনি বললেন, هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لاَ إِثْمَ فِيْهِ وَلاَ بَغْىَ وَلاَ غِلَّ وَلاَ حَسَدَ 'সে হবে আল্লাহভীরু ও পরিচ্ছন্ন হৃদয়; যাতে কোন পাপ নেই, সত্যবিমুখতা নেই, বিদ্বেষ নেই, হিংসা নেই'।[4]

হিংসুক থেকে বাঁচার পথ :

(১) ক্ষমতা থাকলে প্রতিরোধ করা। যেমন রাসূল (ছাঃ) মদীনার ইহুদী গোত্রগুলির বিরুদ্ধে করেছিলেন এবং অবশেষে তাদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করেছিলেন।

(২) সত্য প্রকাশ করে দেওয়া এবং হিংসুক ব্যক্তি বা দলকে এড়িয়ে চলা ও তাদের শাস্তির বিষয়টি আল্লাহর উপর ন্যস্ত করা। যেমন আল্লাহ হিংসুক ইহুদী সম্পর্কে বলেন, فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ- 'তোমরা তাদের ক্ষমা কর ও উপেক্ষা করে চলো যতক্ষণ না আল্লাহ স্বীয় আদেশ নিয়ে আগমন করেন।

নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান' *(বাক্বারাহ ২/১০৯)*। হিংসা মুক্ত সমাজ গঠনের জন্য এটাই উত্তম। কেননা হিংসা কেবল হিংসা আনয়ন করে।

ভাল-র প্রতি হিংসা :

মানুষ অনেক সময় ভাল-র প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে। যেমন নবী-রাসূলগণের প্রতি, কুরআন ও হাদীছের প্রতি, ইসলামের প্রতি, সমাজের সত্যসেবী দ্বীনদারগণের প্রতি এবং বিশেষ করে সমাজ সংস্কারক মুত্তাক্বী আলেমগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা পাপাচারী মানুষের স্বভাবগত বিষয়। যেমন (ক) সৃষ্টির সূচনায় প্রথম পাপ ছিল আদম (আঃ)-এর প্রতি ইবলীসের হিংসার পাপ। আদমের উচ্চ সম্মান দেখে সে হিংসায় জ্বলে উঠেছিল। তাকে আদমের প্রতি সম্মানের সিজদা করতে বলা হলে সে করেনি। বরং যুক্তি দেখিয়ে বলেছিল আমি আগুনের তৈরী ও সে হ'ল মাটির তৈরী। অতএব আগুন কখনো মাটিকে সিজদা করতে পারে না। এ যুক্তি দেখিয়ে সে আল্লাহর হুকুম মানতে অস্বীকার করে ও অহংকার করে। ফলে সে জান্নাত থেকে চিরকালের মত বিতাড়িত হয়। অনুরূপভাবে (খ) আদম-পুত্র কাবীল তার ভাই হাবীলকে হত্যা করে হিংসা বশে। কারণ হাবীল ছিল মুত্তাকী পরহেযগার ও শুদ্ধ হৃদয়ের মানুষ। সে আল্লাহকে ভালবেসে তার সর্বোত্তম দুম্বাটি আল্লাহর ওয়াস্তে কুরবানীর জন্য পেশ করে। অথচ তার কৃষিজীবী ভাই ক্বাবীল তার ক্ষেতের সবচেয়ে খারাব ফসলের একটা অংশ কুরবানীর জন্য পেশ করে। ফলে আল্লাহ তারটা কবুল না করে হাবীলের কুরবানী কবুল করেন এবং আসমান থেকে আগুন এসে তা উঠিয়ে নিয়ে যায়। এতে ক্বাবীল হিংসায় জ্বলে ওঠে ও হাবীলকে হত্যা করে। পরবর্তীকালে (গ) ইহুদীরা মুসলমানদের হিংসা করে তাদের নিকট শেষনবী (ছাঃ)-এর আগমনের কারণে। কেননা ইহুদীরা ভেবেছিল শেষনবীর আগমন হবে তাদের মধ্য থেকে। কিন্তু সেটা না হওয়ায় তারা ক্ষেপেছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, وَدَّ كَثِيْرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ 'আহলে কিতাবগণের মধ্যে বহু লোক চায় তোমাদেরকে ঈমান আনার পরে কুফরীতে ফিরিয়ে নিতে তাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরে স্রেফ বিদ্বেষবশতঃ' (বাক্বারাহ ২/১০৯)।

ওদিকে আবু জাহল শেষনবী (ঘ) মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সত্য বলে স্বীকার করেও মেনে নেয়নি তার বনু মখযূম গোত্রে জন্ম না হয়ে বনু হাশেম গোত্রে জন্ম হওয়ার কারণে। এভাবে ভাল-র প্রতি হিংসার ইতিহাস চিরন্তন। ঐসব হিংসুকরা নিজেদের হিংসা গোপন করার জন্য ভাল-র বিরুদ্ধে নানাবিধ মিথ্যা রটনা করে। তাকে নানাবিধ কষ্ট দেয়,

এমনকি দেশ ত্যাগে বাধ্য করে ও হত্যার চেষ্টা করে। যেমন শেষনবী (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে তাঁর বিরোধীরা করেছিল। অথচ তিনি এজন্য আদৌ দায়ী ছিলেন না। যদিও প্রবাদ আছে যে, ‘এক হাতে তালি বাজে না’। অথচ নবী-রাসূলগণ ও তাঁদের নিখাদ অনুসারী নেককার মুমিনদের বিরুদ্ধে যাবতীয় ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত এক পক্ষীয় হয়ে থাকে। সকল যুগে এর অসংখ্য নযীর রয়েছে। বর্তমান যুগেও এমন নযীরের কোন অভাব নেই।
সেকারণ হিংসুকদের অনিষ্টকারিতা হ’তে বাঁচার জন্য আল্লাহ আমাদের প্রার্থনা করতে বলেছেন- وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই হিংসুকের অনিষ্টকারিতা হতে যখন সে হিংসা করে’ (ফালাক্ব ১১৩/৫)। যে সমাজে হিংসার প্রসার যত বেশী, সে সমাজে অশান্তি তত বেশী। সমাজে অতক্ষণ যাবত কল্যাণ ও শান্তি বিরাজ করে, যতক্ষণ সেখানে হিংসার প্রসার না ঘটে। যামরাহ বিন ছা‘লাবাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَحَاسَدُوْا ‘মানুষ অতক্ষণ কল্যাণের মধ্যে থাকবে, যতক্ষণ তারা পরস্পরে হিংসা না করবে’।[5]

হিংসার পরিণাম :

হিংসুক ব্যক্তি অন্যকে ক্ষতি করার আগে সে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কেননা শুরুতেই সে হিংসার আগুনে জ্বলতে থাকে। হিংসা দূর না হওয়া পর্যন্ত এটাই তার জন্য স্থায়ী দুনিয়াবী শাস্তি। তার চেহারা সর্বদা মলিন থাকে। তার সাথে তার পরিবারে হাসি ও আনন্দ থাকে না। অন্যের ক্ষতি করার চক্রান্তে ও ষড়যন্ত্রে সে সর্বদা ব্যস্ত থাকে। প্রতিপক্ষের হামলার ভয়ে সে সর্বদা ত্রস্ত ও ভীত থাকে। নিশুতি রাতে বাঁশ ঝাড়ে কঞ্চির শব্দে জিনের ভয়ে হার্টফেল করার মত হিংসুক ব্যক্তি সর্বদা কল্পিত শত্রুর ভয়ে শংকিত থাকে। তার অন্তর সদা সংকুচিত থাকে। তারই মত শঠেরা তার বন্ধু হয়। ফলে সৎ সংসর্গ থেকে সে বঞ্চিত হয়। ঘুণ পোকা যেমন কাঁচা বাঁশকে ভিতর থেকে কুরে কুরে খায়, হিংসুক ব্যক্তির অন্তর তেমনি হিংসার আগুন কুরে কুরে খায়। এক সময় সে ধ্বংস হয়ে যায়, যেমন ঘুণে ধরা বাঁশ হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ে যায়। এভাবে দুনিয়ায় সে এসি ঘরে শুয়ে থেকে হিংসার আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরে। আর মৃত্যুর পরে তাকে গ্রাস করে জাহান্নামের ভয়াবহ আগুন। দুনিয়ায় সে যেমন ছিল সর্বদা মলিন চেহারার অসুখী মানুষ, আখেরাতেও সে উঠবে তেমনি মলিন চেহারায় অধোমুখি হয়ে। আল্লাহ বলেন, وَوُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ- تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ- أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ‘অনেক মুখমন্ডল সেদিন হবে ধূলি ধূসরিত’ ‘কালিমালিপ্ত’ তারা হ’ল অবিশ্বাসী পাপিষ্ঠ’ (‘আবাসা ৮০/৪০-৪২)। তাদেরকে দেখে যেমন দুনিয়াতে চেনা যেত। আখেরাতেও তেমনি চেনা

যাবে। যেমন আল্লাহ বলেন,يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْأَقْدَامِ 'অপরাধীদের চেনা যাবে তাদের চেহারা দেখে। অতঃপর তাদেরকে পাকড়াও করা হবে কপালের চুল ও পা ধরে' (রহমান ৫৫/৪১)।

হযরত যুবায়ের ইবনুল 'আওয়াম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِىَ الْحَالِقَةُ 'তোমাদের মধ্যে পিপীলিকার ন্যায় প্রবেশ করবে বিগত উম্মতগণের রোগ। আর তা হ'ল হিংসা ও বিদ্বেষ। যা হ'ল ছাফকারী। لاَ أَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ 'আমি বলিনা যে চুল ছাফ করবে, বরং তা দ্বীনকে ছাফ করে ফেলবে'।[6] অর্থাৎ ক্ষুর ও ব্লেড যেমন চুল ছাফ করে দেয়। হিংসা ও বিদ্বেষ তেমনি দ্বীনকে বিদূরিত করে দেয়।

ইসলামের সোনালী যুগে মুসলমানদের উন্নতি ও বিশ্ব বিজয়ের মূলে কারণ ছিল তাদের পারস্পরিক মহববত-ভালোবাসা ও বিদ্বেষমুক্ত হৃদয়ের সুদৃঢ় বন্ধন। তারা অন্যের দুঃখ-বেদনাকে নিজের সাথে ভাগ করে নিতেন। তারা অন্যের জন্য সেটাকেই ভালবাসতেন, যেটা নিজের জন্যে ভালবাসতেন। এ বিষয়ে মক্কার মুহাজির মুসলমানদের জন্য মদীনার আনছারগণের অনন্য ত্যাগের দৃষ্টান্ত বিশ্ব ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। এমনকি যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যুপথ যাত্রী মুসলিম সৈনিক তৃষ্ণার্ত পানিপ্রার্থী অন্য সৈনিকের স্বার্থে নিজে পানি পান না করেই প্রাণত্যাগ করে মৃত্যুর দুয়ারে মানবতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন। ইতিহাসে এর কোন তুলনা নেই।

হযরত আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট বসে আছি। এমন সময় তিনি বললেন, يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ 'এখন তোমাদের নিকট একজন জান্নাতী মানুষের আগমন ঘটবে'। অতঃপর আনছারদের একজন ব্যক্তি আগমন করল। যার দাড়ি দিয়ে ওযুর পানি টপকাচ্ছিল ও তার বামহাতে জুতা জোড়া ছিল। দ্বিতীয় দিন ও তৃতীয় দিন রাসূল (ছাঃ) একই রূপ বললেন এবং পরক্ষণে একই ব্যক্তির আগমন ঘটলো। অতঃপর যখন রাসূল (ছাঃ) মজলিস থেকে উঠলেন, তখন আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল 'আছ তাঁর পিছু নিলেন। ...আনাস (রাঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বলেন যে, আমি তার বাসায় একরাত বা তিন রাত কাটাই। কিন্তু তাকে রাতে ছালাতের জন্য উঠতে দেখিনি। কেবল ফজরের জন্য ওযূ করা ব্যতীত। তাছাড়া আমি তাকে সর্বদা ভাল কথা বলতে শুনেছি। এভাবে তিনদিন তিনরাত চলে গেলে আমি তার আমলকে সামান্য মনে করতে লাগলাম(كِدْتُ أَنْ أَحْتَقِرَ عَمَلَهُ)। আমি তখন ঐ ব্যক্তিকে বললাম, আপনার সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) এই এই কথা

বলেছিলেন এবং আমিও আপনাকে গত তিনদিন যাবৎ দেখছি। কিন্তু আপনাকে বড় কোন আমল করতে দেখলাম না (فَلَمْ أَرَكَ تَعْمَلُ كَبِيْرَ عَمَلٍ)। তাহলে কোন বস্তু আপনাকে ঐ স্থানে পৌঁছিয়েছে, যার সুসংবাদ আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে শুনিয়েছেন। তিনি বললেন, আমি যা করি তাতো আপনি দেখেছেন। অতঃপর যখন আমি চলে আসার জন্য পিঠ ফিরাই, তখন তিনি আমাকে ডেকে বললেন, مَا هُوَ إِلاَّ مَا رَأَيْتَ غَيْرَ أَنِّيْ لاَ أَجِدُ فِيْ نَفْسِيْ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ غِلاًّ وَلاَ أَحْسُدُ أَحَداً عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ 'আপনি যা দেখেছেন, তাতো দেখেছেন। তবে আমি আমার অন্তরে কোন মুসলিমের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ রাখি না এবং আমি কারু প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত কোন কল্যাণের উপর হিংসা পোষণ করি না'। একথা শুনে আব্দুল্লাহ বিন আমর বললেন, هَذِهِ الَّتِيْ بَلَغَتْ بِكَ وَهِيَ الَّتِيْ لاَ نُطِيْقُ 'এটিই আপনাকে উক্ত স্তরে পৌঁছেছে। এটি এমন এক বস্তু যা আমরা করতে সক্ষম নই।[7]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ يَجْتَمِعَانِ فِيْ قَلْبِ عَبْدٍ الإِيْمَانُ وَالْحَسَدُ 'কোন বান্দার অন্তরে ঈমান ও হিংসা একত্রিত হতে পারে না'।[8] অর্থাৎ একটি অন্তরে হয় ঈমান থাকবে, নয় হিংসা থাকবে। ঈমানদারের অন্তরে হিংসা থাকবে না, হিংসুকের অন্তরে ঈমান থাকবে না। মুমিন কখনো হিংসুক নয়, হিংসুক কখনো মুমিন নয়। অর্থাৎ পূর্ণ মুমিন নয়।

হিংসুকদের চটকদার যুক্তি :

হিংসুক ব্যক্তি তার চাকচিক্যপূর্ণ কথা ও আকর্ষণীয় যুক্তির মাধ্যমে সত্যকে মিথ্যা বলে ও মিথ্যাকে সত্য বলে। এ বিষয়ে খ্যাতনামা তাবেঈ ইকরিমা বিগত যুগে বনু ইস্রাঈলের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, তাদের মধ্যে তিনজন বিখ্যাত কাযী বা বিচারপতি ছিলেন। পরে তাদের একজন মারা গেলেন। তখন অন্যজন তার স্থলাভিষিক্ত হ'লেন। তিনি বিচারকার্য চালাতে থাকলেন। এমন সময় একদিন আল্লাহ একজন ফেরেশতাকে পাঠালেন। যিনি ঘোড়ায় চড়ে একজন ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। যে বাছুরসহ তার গাভীকে পানি পান করাচ্ছিল। ফেরেশতা বাছুরটিকে তার দিকে ডাক দিলেন। তাতে বাছুরটি ঘোড়ার পিছে পিছে চলল। তখন ঐ লোকটি ছুটে এসে তার বাছুরটিকে ফিরিয়ে নিতে চাইল এবং বলল, হে আল্লাহর বান্দা! এটি আমার বাছুর এবং আমার এই গাভীর বাচ্চা। ফেরেশতা বললেন, বরং ওটা আমার বাছুর এবং আমার এই ঘোড়ার বাচ্চা। কেউ দাবী না ছাড়লে অবশেষে তারা একজন কাযীর কাছে গেলেন। বাছুরের মালিক বলল, এই লোকটি আমার বাছুরের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাকে ডাকল, আর বাছুরটি

তার পিছে পিছে চলে গেল। অথচ বাছুরটি আমার। কিন্তু এখন সে আমাকে ফেরৎ দিচ্ছে না। উত্তরে বিবাদী ফেরেশতা বললেন এমতাবস্থায় যে, তার হাতে তিনটি বেত ছিল। যার অনুরূপ কোন বেত সচরাচর দেখা যায় না। তার মধ্যে একটি বেত তিনি বিচারকের হাতে দিয়ে বললেন, আপনি এটা দিয়ে আমাদের মাঝে ফায়ছালা করুন। বিচারক বললেন, কিভাবে? বিবাদী বললেন, আমরা বাছুরটাকে ঘোড়া ও গাভীর পিছনে ছেড়ে দিব। অতঃপর বাছুরটি যার পিছে পিছে যাবে, সেটি তার হবে। বিচারক সেটাই করলেন। দেখা গেল যে, বাছুরটি ঘোড়ার পিছু নিল। তখন বিচারক বাছুরটি ঘোড়ার বলে রায় দিলেন।

বাছুরের মালিক এ রায় মানল না। সে বলল, আমি আরেকজন বিচারকের কাছে যাব। সেখানে গিয়ে উভয়ে পূর্বের মত বাছুরটিকে নিজের বলে দাবী করল এবং আগের মত যুক্তি প্রদর্শন করল। সেখানেও একই রায় হ'ল। তখন বাদী তাতে রাযী না হয়ে তৃতীয় বিচারকের কাছে গেল। বিবাদী তাকে এবার তৃতীয় বেতটি দিলেন। কিন্তু তিনি তা নিতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, আমি আজকে তোমাদের বিচার করব না। তারা বলল, কেন করবেন না? তিনি বললেন, কেননা আমি আজ ঋতুবতী। বিবাদী ফেরেশতা একথা শুনে বলে উঠলেন, *সুবহানাল্লাহ!* পুরুষ লোক কখনো ঋতুবতী হয়? তখন বিচারক বললেন, ঘোড়া কখনো গরুর বাছুর জন্ম দেয়? অতঃপর তিনি বাছুরটিকে গাভীর মালিককে দিয়ে দিলেন। এবার ফেরেশতা বললেন, আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করেছেন। তিনি তোমার উপর খুশী হয়েছেন এবং ঐ দুই বিচারকের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন'।[9]

প্রকৃত মুসলিমের পরিচয় :

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ .التَّقْوَى هَا هُنَا .وَيُشِيْرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তাকে যুলুম করে না, লজ্জিত করে না, নিকৃষ্ট ভাবে না। তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে বলে তিনি নিজের বুকের দিকে তিনবার ইশারা করেন। অতঃপর বলেন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে তার অন্য মুসলিম ভাইকে নিকৃষ্ট ভাবে। মনে রেখ এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের জন্য হারাম হ'ল তার রক্ত, তার মাল ও তার ইযযত'।[10]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও মাল-সম্পদ দেখেন না। বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও আমল'।[11]

হিংসুকের পরিণতি :

হিংসুক ও বিদ্বেষী মানুষ কোন অবস্থায় শান্তি পায় না। তার কোন সৎবন্ধু জোটে না। সে কখনোই সুপথপ্রাপ্ত হয় না। তার হৃদয়-মন থাকে সর্বদা জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডের মত। যেখান থেকে সর্বদা চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র, ধোঁকা ও মিথ্যাচারের দুর্গন্ধযুক্ত স্ফুলিঙ্গ সমূহ বের হয়। সে সর্বদা নিজেকে বিজয়ী ভাবে। অথচ সেই-ই সবচেয়ে পরাজিত। সে নিজেকে বীর ভাবে, অথচ সেই-ই সবচেয়ে ভীরু। ভীত-চকিত সর্পের ন্যায় সে তার কল্পিত প্রতিপক্ষকে ছোবল মারার জন্য সর্বদা ফণা উঁচিয়ে থাকে। এভাবে আমৃত্যু সে হিংসার আগুনে জ্বলতে থাকে। ফলে হিংসা-বিদ্বেষ অন্যকে হত্যা করার আগে নিজেকে হত্যা করে। এদিক দিয়ে বিচার করলে হিংসাকেই বড় ন্যায় বিচারক বলতে হয়। কেননা সে সর্বাগ্রে হিংসুককে শাস্তি দেয়, অতঃপর অন্যকে। হিংসুক ব্যক্তি শত চেষ্টায়ও তা গোপন রাখতে পারে না। কেননা শত্রুকে ঘায়েল করার পূর্বে সে নিজেই ঘায়েল হয়। যার নমুনা তার চেহারায় ও কর্মে ফুটে ওঠে। জনৈক কবি বলেন,

يا حاسداً لي على نعمتي +أتدري على من أسأتَ الأدبْ

أسأتَ على الله في فعلهِ +لأنكَ لم ترضَ لي ما قسمْ

فأخزاكَ ربي بأنْ زادني +وسدَّ عليكَ وجوهَ الطلبْ

(১) 'হে হিংসুক ব্যক্তি! যে আমার নে'মতে হিংসা করে থাক। তুমি কি জানো তুমি কার সাথে বে-আদবী করো?

(২) তুমি আল্লাহর কর্মকে মন্দ বলে থাক। কেননা তিনি আমাকে যা (রহমত) বণ্টন করেছেন তুমি তাতে সন্তুষ্ট নও।

(৩) অতএব আমার প্রভু তোমাকে লাঞ্ছিত করুন এ কারণে যে তিনি আমাকে রহমত বেশী দিয়েছেন। আর তোমার উপরে তা বন্ধ করেছেন'।

সৎকর্মশীল ঈমানদারগণ কখনো কাউকে হিংসা করেন না। কারু প্রতি বিদ্বেষী হন না। তারা সর্বদা অন্যের হিংসার শিকার হন। তারা আসামী হন, কিন্তু সহজে বাদী হন না। যুগে যুগে এটাই ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। এজন্য প্রবাদ বাক্য হয়ে রয়েছে, هل مَاتَ الْبُخَارِيُّ غَيْرَ مَحْسُوْدٍ ؟ 'ইমাম বুখারী কি হিংসুকের হামলা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করতে

পেরেছেন’? এর পরেও প্রকৃত মুমিনগণ পাল্টা হিংসা করেন না। বিদ্বেষ করেন না। বরং প্রতিপক্ষের হেদায়াত কামনা করেন। কবি কুমায়েত আল-আসাদী বলেন,

إن يحسدونني فإني غيرُ لائمهم +قبلي من الناس أهلُ الفضل قد حُسِدُوا

فدام لي ولهم ما بي وما بهم +ومات أكثرنا غيظاً بما يجد

أنا الذي يجدوني في صدورهم +لا أرتقي صدراً منها ولا أرِدُ

(১) ‘তারা যদি আমাকে হিংসা করে, পাল্টা আমি তাদের নিন্দা করব না। কেননা আমার পূর্বে বহু কল্যাণময় ব্যক্তি হিংসার শিকার হয়েছেন।

(২) অতএব আমার ও তাদের সঙ্গে (আল্লাহর রহমত) যা ছিল, তা থাকবে। অথচ আমাদের অধিকাংশ মানুষ মারা গেছে যা সে পেয়েছে তাতে ক্রুদ্ধ অবস্থায়।

(৩) আমি সেই ব্যক্তি যে, তারা আমাকে সর্বদা তাদের বুকের মধ্যে পাবে, যেখান থেকে আমি না ফিরে গেছি, না অবতরণ করেছি’।

হৃদয়কে হিংসামুক্ত রাখার উপায় :

(১) হিংসা হ’ল শয়তানী আমল। শয়তান সর্বদা মানুষকে প্ররোচনা দিয়ে থাকে। তাই তার হাত থেকে বাঁচার জন্য শয়তানের প্রতি তীব্র ঘৃণা থাকা এবং তার বিরুদ্ধে প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকা আবশ্যক। সেইসাথে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করে সর্বদা ছালাত শেষে বা ঘুমাতে যাবার সময় বা যেকোন সময় সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়া। (২) এছাড়া নিম্নোক্ত দো‘আটি পড়া আবশ্যক। আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মাদীকে শিখিয়ে দিয়েছেন, رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ও আমাদের সেইসব ভাইকে তুমি ক্ষমা কর। যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর তুমি আমাদের অন্তরে মুমিনদের বিরুদ্ধে কোনরূপ বিদ্বেষ সঞ্চার করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয়ই তুমি স্নেহশীল ও দয়াবান’ *(হাশর ৫৯/১০)*।

মুসলমানকে আল্লাহর পথে সংগ্রামে পরস্পরকে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় থাকতে বলা হয়েছে *(ছফ ৬১/৪)* । এটা কেবল তখনই সম্ভব, যখন হিংসা ও বিদ্বেষমুক্ত মনে আমরা পরস্পরকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসতে পারব এবং এর বিনিময়ে স্রেফ আল্লাহর নিকটে পারিতোষিক কামনা করব।

আল্লাহ আমাদের সকলকে পারস্পরিক হিংসা ও বিদ্বেষ থেকে রক্ষা করুন এবং আমাদের সবাইকে ভাই-ভাই হবার তাওফীক দিন- আমীন!

[1]. বুখারী হা/৬০৭৬; মুসলিম হা/২৫৫৯; মিশকাত হা/৫০২৮।

[2]. বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৪৯৬১।

[3 আবুদাঊদ হা/৪৬৮১; তিরমিযী হা/২৫২১; মিশকাত হা/৩০।

[4]. ইবনু মাজাহ হা/৪২১৬; মিশকাত হা/৫২২১।

[5]. ত্বাবারাণী হা/৮১৫৭; ছহীহাহ হা/৩৩৮৬।

[6]. তিরমিযী; মিশকাত হা/৫০৩৯।

[7]. হাকেম ৩/৭৯, আহমাদ হা/১২৭২০, *আরনাঊত্ব ছহীহ বলেছেন; আলবানী প্রথমে ছহীহ পরে যঈফ বলেছেন (তারাজু'আতুল আলবানী হা/৪৮); হাকেম ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন।*

[8]. নাসাঈ হা/৩১০৯, সনদ হাসান।

[9]. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৯/২৪৭।

বিদ্বেষ : আমল কবুলের এক শক্ত অন্তরায়

হিংসার পথ ধরেই আমাদের মনে আরেকটি রোগ জন্ম নেয়। একে আমরা বিদ্বেষ বলি। এমনিতেও শব্দ দুটি একে অন্যের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। হিংসা যেমন চুলার আগুনের মতোই আমাদের নেক আমলগুলো পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেয়, বিদ্বেষও তেমনি আড়াল হয়ে দাঁড়ায় আমাদের নেক আমলের সামনে। হাদীস শরীফে বিদ্বেষ পোষণকারীদের জন্যে সতর্কবার্তা উচ্চারিত হয়েছে, বিভিন্ন আঙ্গিকে, বিভিন্ন উপস্থাপনায়। বিদ্বেষের ভয়াবহতা আমরা একটি হাদীস থেকে কিছুটা আন্দাজ করতে পারি। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : إِنَّ اللهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ. অর্ধ শাবানের রাতে (অর্থাৎ শবে বরাতে) আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল সৃষ্টিকেই ক্ষমা করে দেন। তবে তিনি মুশরিক ও বিদ্বেষপোষণকারীকে ক্ষমা করেন না। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৩৯০ এই হাদীসে দুটি বিষয় লক্ষণীয় : এক. আল্লাহ তাআলা শবে বরাতে যখন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন, তাঁর সকল সৃষ্টিই যখন সেই ক্ষমা লাভে ধন্য হয়, তখনো বিদ্বেষপোষণকারী কেউ এ ক্ষমা পাবে না। দুই. বিদ্বেষপোষণকারীকে এ হাদীসে মুশরিকের সহযাত্রী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মুশরিককে যেমন ওই রাতে ক্ষমা করা হয় না, তেমনি বিদ্বেষপোষণকারীকেও ক্ষমা করা হয় না। মুশরিক তো সে-ই, যে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে শিরক করে। আর শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় কবিরা গোনাহ। শিরক করার পর তওবা না করে যে মারা যাবে তার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা খুবই স্পষ্ট- اِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ مَنْ

يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا নিশ্চয় আল্লাহ তার সঙ্গে শিরক করাকে ক্ষমা করবেন না, এছাড়া অন্য কিছু যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। আর যদি কেউ আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে তাহলে সে তো এক মহাপাপে জড়িয়ে পড়ল। -সূরা নিসা (৪) : ৪৮ এই হচ্ছে শিরক আর মুশরিকের পরিচয়। এ মুশরিকের সঙ্গে যখন কাউকে জুড়ে দেয়া হয় তখন তার হতভাগ্য আর অশুভ পরিণতি সম্পর্কে বিস্তারিত বলার প্রয়োজন থাকে না। একদিকে সাধারণ ক্ষমা থেকে বঞ্চিত, অপরদিকে মুশরিকের সহযাত্রী। বিদ্বেষকারীর গন্তব্য তাহলে কোথায়! মুসনাদে আহমাদের রেওয়ায়েতে উপরোক্ত হাদীসটি উল্লেখিত হয়েছে এভাবে- يَطّلِعُ اللَّهُ عَزّ وَجَلّ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلاَّ لِاِثْنَيْنِ: مُشَاحِنٍ ، وَقَاتِلِ نَفْسٍ. অর্ধ শাবানের রাতে আল্লাহ তাআলা আপন সৃষ্টির দিকে সদয় দৃষ্টিতে তাকান। তখন তিনি তাঁর বান্দাদের ক্ষমা করে দেন। তবে দুইজনকে নয়-বিদ্বেষ পোষণকারী আর মানুষ হত্যাকারী। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৬৬৪২ এই হাদীসে বিদ্বেষপোষণকারীর সঙ্গী মানুষ হত্যাকারী। অন্যায়ভাবে কেউ যখন কাউকে হত্যা করে সেটা তো কুরআনের ভাষায় সকল মানুষকে হত্যার সমান অপরাধ! কুরআনের ভাষায় দেখুন- كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا আমি বনী ইসরাইলকে এ বিধান দিয়েছিলাম, যদি কেউ কাউকে হত্যা করে, প্রাণের বিনিময় কিংবা পৃথিবীতে বিশৃংখলা ছড়ানোর অপরাধে নয়, তাহলে সে যেন সকল মানুষকেই হত্যা করল। -সূরা মায়িদা (৫) : ৩২ আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- تُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِى كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ فَيَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا প্রতি বৃহস্পতিবার ও সোমবার মানুষের আমল (আল্লাহ তাআলার সামনে) পেশ করা হয়। তখন আল্লাহ এমন সকল মানুষকে ক্ষমা করে দেন, যে তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করে না। তবে এমন দুজনকে তিনি ক্ষমা করেন না, যাদের অন্তরে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ রয়েছে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়-তাদের দুজনকে দেখো, তারা একে অন্যের সঙ্গে মিলে যায় কি না। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৬৫ এই তো বিদ্বেষ! এই বিদ্বেষ বান্দার আমল কবুল হওয়ার পথে এক শক্ত দেয়াল। প্রতি সপ্তাহে দুদিন যখন বান্দার যাবতীয় আমল আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়, আর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ঘোষিত হয় সাধারণ ক্ষমা, তখনো বিদ্বেষপোষণকারীরা বঞ্চিত। কথা হলো, বিদ্বেষ কী? খুব সহজ ভাষায় বিদ্বেষের পরিচয় দিয়েছেন হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রাহ.। তিনি বলেছেন, স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে নিজের অন্তরে কারও প্রতি অশুভ কামনা পোষণ

করা আর তাকে কষ্ট দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করাই হচ্ছে বিদ্বেষ। অর্থাৎ কারও সম্পর্কে এমন কামনা করা-সে কষ্টে পড়ুক, তার ক্ষতি হোক, তার ব্যবসায় লোকসান হোক ইত্যাদি; এর সঙ্গে তাকে কষ্ট দেয়া এবং ক্ষতি করার তৎপরতা চালানো। আর যদি ওই ব্যক্তি কোনো বিপদে পড়ে, তার কোনো ক্ষতি হয় তাহলে আনন্দিত বোধ করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদ্বেষের মূলে থাকে ক্রোধ ও ক্ষোভ। কেউ কাউকে কষ্ট দিলে যদি সঙ্গে সঙ্গে সে ওই কষ্টের প্রতিবিধান করতে পারে, প্রতিশোধ নিয়ে নিতে পারে তাহলে মনে আর ক্ষোভ থাকে না। কিন্তু আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে যদি কোনো কারণে কেউ প্রতিশোধ নিতে না পারে, তাহলে অন্যায়কারীর প্রতি মনে ক্ষোভ জন্ম নেয়। হতে পারে সে বয়সে বড়, কিংবা তার ক্ষমতা অনেক বেশি, অথবা সমাজের চোখে সে এতটাই মর্যাদাবান যে, আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাকে কিছুই করতে পারবে না। এমন পরিস্থিতিতে কারও কাছে বিচারও প্রার্থনা করা যায় না, আবার প্রতিশোধও নেয়া যায় না। এভাবে যখন মনে ক্ষোভ জন্ম নেয়, আর এ ক্ষোভ নিরসনের কোনো পথ সামনে থাকে না, তখনই ধীরে ধীরে এ ক্ষোভ বিদ্বেষে রূপ নেয়। নিজে প্রতিশোধ নিতে না পারায় এখন কামনা করে-তার যদি কোনো ক্ষতি হতো। পাশাপাশি এ অপেক্ষায়ও থাকে-যদি কখনো সুযোগ হয় তাহলে তাকে আমি দেখে নেব! আমাকে সে আর কতটুকু ভুগিয়েছে, আমি তাকে এর দশগুণ ভোগাব! এরই নাম বিদ্বেষ। এর অবধারিত ফল-যখনই সে সুযোগ পাবে, তাকে কষ্ট দেবে। পারলে হাতে কষ্ট দেবে, তা না পারলে মুখে কষ্ট দেবে। সুযোগ পেলেই তার গীবত করবে, নিন্দা-সমালোচনা করবে। এটাই হচ্ছে বিদ্বেষের কুফল। সুযোগ পেলে সে যদি নিজের আঘাত পরিমাণ কষ্ট দিত তাহলে একটা কথা ছিল। এতটুকু প্রতিশোধ নেয়া বৈধ- সন্দেহ নেই। কিন্তু দীর্ঘদিনের চাপা ক্ষোভ আর বিদ্বেষের ফলে কখনো সুযোগ পেয়ে সে যদি আঘাতপ্রাপ্ত থাকার পরিবর্তে আঘাতকারী হয়ে পড়ে, যতটুকু অপরাধ তার সঙ্গে করা হয়েছিল সে যদি প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ওই মাত্রা ছাড়িয়ে যায় বহুগুণে, তাহলে এটা নিশ্চিত অপরাধ। মোটকথা, বিদ্বেষ যখন মনে মনে লালন করতে থাকে, তখন তা আমল কবুল হওয়ার পথে আড়াল হয়ে দাঁড়ায়, একে মনে পোষণ করে বঞ্চিত থাকতে হয় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ঘোষিত সাধারণ ক্ষমা থেকে, আর শেষে যখন তা মনের গণ্ডি পেরিয়ে বাইরে আসার সুযোগ পায় তখন সীমা অতিক্রমের ফলে হয়ে পড়ে উল্টো অপরাধী। এতদিনের মজলুম এখন জালেম। জালেম হয়ে পড়ে মজলুম। অসম্ভব কী, এখন নতুন মজলুমের মনে সৃষ্টি হবে ক্ষোভ ক্রোধ আর বিদ্বেষ? বিদ্বেষের কালো মেঘ যখন মনে জমাট বাঁধতে থাকে দিনের পর

দিন, এরপর দীর্ঘ অপেক্ষা পেরিয়ে প্রতিশোধের সুযোগ হাতে আসে তখন সীমা ছাড়িয়ে এভাবে জালেম হয়ে পড়ার আশংকাই প্রবল। আল্লাহ তাআলা তাই সতর্ক করছেন এভাবে- وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا - . তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে বাধা দিয়েছিল- এ কারণে কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সীমালঙ্ঘন করতে প্ররোচিত না করে। -সূরা মায়িদা (৫) : ২ ঘটনাটি ছিল এমন- হিজরি ষষ্ঠ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় দেড় হাজার সাহাবী সঙ্গে নিয়ে ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা নগরীর দিকে রওয়ানা হন। কিন্তু মক্কার উপকণ্ঠে হুদায়বিয়া নামক স্থানে তারা পৌঁছলে মক্কার মুশরিকরা তাদের বাধা দেয়। মুসলমানরা ছিলেন ইহরাম পরিহিত। ছিলেন মক্কার হারাম এলাকায়। কিন্তু কাফেররা সবরকম বিধান লঙ্ঘন করে মুসলমানদের পথ আটকে দেয়। শেষে তাদের সঙ্গে সন্ধি করে সেখান থেকেই ফিরে আসতে হয় মুসলমানদের। আল্লাহ তাআলা তাই এই আয়াতে সতর্ক করে বলছেন- তারা তোমাদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করেছিল, তোমাদের ইহরামের সঙ্গে অন্যায় করেছিল, অন্যায়ভাবে তারা তোমাদের মসজিদে হারামে প্রবেশের পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল। তাই বলে তোমরা আবার তাদের ওপর জুলুম করে বসো না। তাদের অন্যায়ের কারণে তোমাদের মনে সৃষ্ট শত্রুতা আর বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে কিছুতেই সীমালঙ্ঘনের পথে নিয়ে না যায়। হিংসা আর বিদ্বেষের শেষ ফল যেহেতু একই-অন্যের ক্ষতি কামনা করা, তাই এর প্রতিকারের পদ্ধতিও অভিন্ন। যার প্রতি মনে বিদ্বেষ জন্ম নিয়েছে লোকসম্মুখে তার প্রশংসা করুন। আল্লাহ তাআলার কাছে তার গোনাহ মাফের জন্যে, তার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে দুআ করুন। দুআ করুন, দুনিয়া-আখেরাতে উভয় জাহানে সমূহ কল্যাণ যেন সে পেয়ে যায়। এর পাশাপাশি বিদ্বেষের যে কুফল পবিত্র হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে তাও স্মরণ করুন। চিন্তা করুন-বিদ্বেষ মনে রেখে যদি আল্লাহ তাআলার সাধারণ ক্ষমা থেকে মাহরূম হতে হয় তাহলে কী পরিণতি হবে! এবং যার প্রতি বিদ্বেষ, যে কষ্টের কারণে বিদ্বেষ, তা ক্ষমা করে দিন, মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিন। এ নিয়ত করুন, আমি আজ তাকে ক্ষমা করে দিলাম- এ আশায় যে, এর বিনিময়ে কাল কিয়ামতের কঠিন বিপদের মুহূর্তে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ এর মূল্যায়ন করবেন- আমার বান্দা হয়ে আরেক বান্দাকে ক্ষমা করে দিল, আমিও এ বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। মহান আল্লাহ কী পরিষ্কার ভাষায় আমাদেরকে এ ক্ষমার দিকে আহ্বান করেছেন, লক্ষ করুন- وَ جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَ اَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللهِ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَ يَبْغُوْنَ

فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ. মন্দের বদলা অনুরূপ মন্দ। তবে যে ক্ষমা করে দেয় ও সংশোধনের চেষ্টা করে তার সওয়াব আল্লাহর যিম্মায় রয়েছে। নিশ্চয়ই তিনি জালেমদেরকে পছন্দ করেন না। যারা নিজেদের ওপর জুলুম হওয়ার পর (সমপরিমাণে) বদলা নেয়, তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। অভিযোগ তো তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের ওপর জুলুম করে ও পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। এরূপ লোকদের জন্যে আছে যন্ত্রণাময় শাস্তি। আর প্রকৃতপক্ষে যে ছবর অবলম্বন করে ও ক্ষমা প্রদর্শন করে- এটা বড় হিম্মতের কাজ। -সূরা শূরা (৪২) : ৪০-৪৩ সহীহ বুখারী শরীফের হাদীস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই ব্যক্তিগত কোনো বিষয়ে কারও কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতেন না। যখন কেউ আল্লাহ তাআলার কোনো অধিকার লঙ্ঘন করত, আল্লাহ তাআলা যা কিছু সম্মানিত করেছেন সেই সম্মান যখন কেউ ক্ষুণœ করত তখনই কেবল তিনি প্রতিশোধ নিতেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৭৮৬ প্রতিশোধ আর ক্ষমার বিষয়ে এই হচ্ছে আমাদের জন্যে নির্দেশনা, আমাদের আদর্শ। এভাবে যদি কাউকে ক্ষমা করে দেয়া যায়, পাশাপাশি তার জন্যে মনে থাকে কল্যাণকামনা আর দুআ, তাহলে মনের আকাশ থেকে বিদ্বেষের কালো মেঘ কেটে যাবেই। ক্ষোভ ও বিদ্বেষহীন জীবন তখন এনে দেবে এক নতুন স্বাদ, নতুন তৃপ্তি। বিদ্বেষের অবশ্য আরেকটি দিক আছে, যেটা নিন্দনীয় নয় মোটেও। বরং শরীয়তের দৃষ্টিতেই তা খুবই পছন্দনীয়। সেটার শিরোনাম দেয়া যায়-'আলহুব্বু ফিল্লাহ ওয়াল বুগযু ফিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর জন্যেই ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্যেই বিদ্বেষ। দ্বীনের জন্যে, আল্লাহ তাআলার জন্যে কেউ যদি কারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তাহলে তা পুরস্কারযোগ্যও। আল্লাহ তাআলার হুকুম যারা হরহামেশা অমান্য করে চলে, যারা তাঁর অবাধ্য, সাধারণ মুসলমানদের ঈমানের পথে আমলের পথে যারা বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাদের প্রতি মুমিন বান্দার অন্তরে বিদ্বেষ থাকাই স্বাভাবিক। এ বিদ্বেষ ঈমানের দাবি। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- مَنْ أَحَبَّ لِلّهِ وَأَبْغَضَ لِلّهِ وَأَعْطَى لِلّهِ وَمَنَعَ لِلّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ. যে আল্লাহর জন্যেই ভালোবাসে, আল্লাহর জন্যেই বিদ্বেষ পোষণ করে, আল্লাহর জন্যেই দান এবং আল্লাহর জন্যেই দান থেকে বিরত থাকে, সে তো ঈমানকে পূর্ণ করে নিল। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৬৮৩

বর্ষ: ১৩, সংখ্যা: ১১

রবিল আউয়াল ১৪৩৯ || ডিসেম্বর ২০১৭

বিদ্বেষ : আমল কবুলের এক শক্ত অন্তরায়

হিংসার পথ ধরেই আমাদের মনে আরেকটি রোগ জন্ম নেয়। একে আমরা বিদ্বেষ বলি। এমনিতেও শব্দ দুটি একে অন্যের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। হিংসা যেমন চুলার আগুনের মতোই আমাদের নেক আমলগুলো পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেয়, বিদ্বেষও তেমনি আড়াল হয়ে দাঁড়ায় আমাদের নেক আমলের সামনে। হাদীস শরীফে বিদ্বেষ পোষণকারীদের জন্যে সতর্কবার্তা উচ্চারিত হয়েছে, বিভিন্ন আঙ্গিকে, বিভিন্ন উপস্থাপনায়। বিদ্বেষের ভয়াবহতা আমরা একটি হাদীস থেকে কিছুটা আন্দাজ করতে পারি। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : إِنّ الله لَيَطّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، إِلّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ. অর্ধ শাবানের রাতে (অর্থাৎ শবে বরাতে) আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল সৃষ্টিকেই ক্ষমা করে দেন। তবে তিনি মুশরিক ও বিদ্বেষপোষণকারীকে ক্ষমা করেন না। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস **১৩৯০**

এই হাদীসে দুটি বিষয় লক্ষণীয় : এক. আল্লাহ তাআলা শবে বরাতে যখন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন, তাঁর সকল সৃষ্টিই যখন সেই ক্ষমা লাভে ধন্য হয়, তখনো বিদ্বেষপোষণকারী কেউ এ ক্ষমা পাবে না। দুই. বিদ্বেষপোষণকারীকে এ হাদীসে মুশরিকের সহযাত্রী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মুশরিককে যেমন ওই রাতে ক্ষমা করা হয় না, তেমনি বিদ্বেষপোষণকারীকেও ক্ষমা করা হয় না। মুশরিক তো সে-ই, যে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে শিরক করে। আর শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় কবিরা গোনাহ। শিরক করার পর তওবা না করে যে মারা যাবে তার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা খুবই স্পষ্ট- اِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا নিশ্চয় আল্লাহ তার সঙ্গে শিরক করাকে ক্ষমা করবেন না, এছাড়া অন্য কিছু যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। আর যদি কেউ আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে তাহলে সে তো এক মহাপাপে জড়িয়ে পড়ল। -সূরা নিসা (৪) : ৪৮ এই হচ্ছে শিরক আর মুশরিকের পরিচয়। এ মুশরিকের সঙ্গে যখন কাউকে জুড়ে দেয়া হয় তখন তার হতভাগ্য আর অশুভ পরিণতি সম্পর্কে বিস্তারিত বলার প্রয়োজন থাকে না। একদিকে সাধারণ ক্ষমা থেকে বঞ্চিত, অপরদিকে মুশরিকের সহযাত্রী। বিদ্বেষকারীর গন্তব্য তাহলে কোথায়! মুসনাদে আহমাদের রেওয়ায়েতে উপরোক্ত হাদীসটি উল্লেখিত হয়েছে এভাবে- يَطّلِعُ اللَّهُ عَزّ وَجَلّ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلاَّ لِاثْنَيْنِ: مُشَاحِنٍ ، وَقَاتِلِ نَفْسٍ. অর্ধ শাবানের রাতে আল্লাহ তাআলা আপন সৃষ্টির দিকে সদয় দৃষ্টিতে তাকান। তখন তিনি তাঁর বান্দাদের ক্ষমা করে দেন। তবে দুইজনকে

নয়-বিদ্বেষ পোষণকারী আর মানুষ হত্যাকারী। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৬৬৪২ এই হাদীসে বিদ্বেষপোষণকারীর সঙ্গী মানুষ হত্যাকারী। অন্যায়ভাবে কেউ যখন কাউকে হত্যা করে সেটা তো কুরআনের ভাষায় সকল মানুষকে হত্যার সমান অপরাধ! কুরআনের ভাষায় দেখুন- كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا আমি বনী ইসরাইলকে এ বিধান দিয়েছিলাম, যদি কেউ কাউকে হত্যা করে, প্রাণের বিনিময় কিংবা পৃথিবীতে বিশৃংখলা ছড়ানোর অপরাধে নয়, তাহলে সে যেন সকল মানুষকেই হত্যা করল। -সূরা মায়িদা (৫) : ৩২ আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- تُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِى كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ فَيَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا প্রতি বৃহস্পতিবার ও সোমবার মানুষের আমল (আল্লাহ তাআলার সামনে) পেশ করা হয়। তখন আল্লাহ এমন সকল মানুষকে ক্ষমা করে দেন, যে তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করে না। তবে এমন দুজনকে তিনি ক্ষমা করেন না, যাদের অন্তরে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ রয়েছে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়-তাদের দুজনকে দেখো, তারা একে অন্যের সঙ্গে মিলে যায় কি না। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৬৫ এই তো বিদ্বেষ! এই বিদ্বেষ বান্দার আমল কবুল হওয়ার পথে এক শক্ত দেয়াল। প্রতি সপ্তাহে দুদিন যখন বান্দার যাবতীয় আমল আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়, আর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ঘোষিত হয় সাধারণ ক্ষমা, তখনো বিদ্বেষপোষণকারীরা বঞ্চিত। কথা হলো, বিদ্বেষ কী? খুব সহজ ভাষায় বিদ্বেষের পরিচয় দিয়েছেন হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রাহ.। তিনি বলেছেন, স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে নিজের অন্তরে কারও প্রতি অশুভ কামনা পোষণ করা আর তাকে কষ্ট দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করাই হচ্ছে বিদ্বেষ। অর্থাৎ কারও সম্পর্কে এমন কামনা করা-সে কষ্টে পড়–ক, তার ক্ষতি হোক, তার ব্যবসায় লোকসান হোক ইত্যাদি; এর সঙ্গে তাকে কষ্ট দেয়া এবং ক্ষতি করার তৎপরতা চালানো। আর যদি ওই ব্যক্তি কোনো বিপদে পড়ে, তার কোনো ক্ষতি হয় তাহলে আনন্দিত বোধ করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদ্বেষের মূলে থাকে ক্রোধ ও ক্ষোভ। কেউ কাউকে কষ্ট দিলে যদি সঙ্গে সঙ্গে সে ওই কষ্টের প্রতিবিধান করতে পারে, প্রতিশোধ নিয়ে নিতে পারে তাহলে মনে আর ক্ষোভ থাকে না। কিন্তু আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে যদি কোনো কারণে কেউ প্রতিশোধ নিতে না পারে, তাহলে অন্যায়কারীর প্রতি মনে ক্ষোভ জন্ম নেয়। হতে পারে সে বয়সে বড়, কিংবা তার ক্ষমতা অনেক বেশি, অথবা সমাজের চোখে সে এতটাই মর্যাদাবান যে, আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাকে কিছুই করতে পারবে না। এমন পরিস্থিতিতে কারও কাছে

বিচারও প্রার্থনা করা যায় না, আবার প্রতিশোধও নেয়া যায় না। এভাবে যখন মনে ক্ষোভ জন্ম নেয়, আর এ ক্ষোভ নিরসনের কোনো পথ সামনে থাকে না, তখনই ধীরে ধীরে এ ক্ষোভ বিদ্বেষে রূপ নেয়। নিজে প্রতিশোধ নিতে না পারায় এখন কামনা করে- তার যদি কোনো ক্ষতি হতো। পাশাপাশি এ অপেক্ষায়ও থাকে-যদি কখনো সুযোগ হয় তাহলে তাকে আমি দেখে নেব! আমাকে সে আর কতটুকু ভুগিয়েছে, আমি তাকে এর দশগুণ ভোগাব! এরই নাম বিদ্বেষ। এর অবধারিত ফল-যখনই সে সুযোগ পাবে, তাকে কষ্ট দেবে। পারলে হাতে কষ্ট দেবে, তা না পারলে মুখে কষ্ট দেবে। সুযোগ পেলেই তার গীবত করবে, নিন্দা-সমালোচনা করবে। এটাই হচ্ছে বিদ্বেষের কুফল। সুযোগ পেলে সে যদি নিজের আঘাত পরিমাণ কষ্ট দিত তাহলে একটা কথা ছিল। এতটুকু প্রতিশোধ নেয়া বৈধ- সন্দেহ নেই। কিন্তু দীর্ঘদিনের চাপা ক্ষোভ আর বিদ্বেষের ফলে কখনো সুযোগ পেয়ে সে যদি আঘাতপ্রাপ্ত থাকার পরিবর্তে আঘাতকারী হয়ে পড়ে, যতটুকু অপরাধ তার সঙ্গে করা হয়েছিল সে যদি প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ওই মাত্রা ছাড়িয়ে যায় বহুগুণে, তাহলে এটা নিশ্চিত অপরাধ। মোটকথা, বিদ্বেষ যখন মনে মনে লালন করতে থাকে, তখন তা আমল কবুল হওয়ার পথে আড়াল হয়ে দাঁড়ায়, একে মনে পোষণ করে বঞ্চিত থাকতে হয় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ঘোষিত সাধারণ ক্ষমা থেকে, আর শেষে যখন তা মনের গণ্ডি পেরিয়ে বাইরে আসার সুযোগ পায় তখন সীমা অতিক্রমের ফলে হয়ে পড়ে উল্টো অপরাধী। এতদিনের মজলুম এখন জালেম। জালেম হয়ে পড়ে মজলুম। অসম্ভব কী, এখন নতুন মজলুমের মনে সৃষ্টি হবে ক্ষোভ ক্রোধ আর বিদ্বেষ? বিদ্বেষের কালো মেঘ যখন মনে জমাট বাঁধতে থাকে দিনের পর দিন, এরপর দীর্ঘ অপেক্ষা পেরিয়ে প্রতিশোধের সুযোগ হাতে আসে তখন সীমা ছাড়িয়ে এভাবে জালেম হয়ে পড়ার আশংকাই প্রবল। আল্লাহ তাআলা তাই সতর্ক করছেন এভাবে- وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا . তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে বাধা দিয়েছিল- এ কারণে কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সীমালঙ্ঘন করতে প্ররোচিত না করে। -সূরা মায়িদা (৫) : ২ ঘটনাটি ছিল এমন- হিজরি ষষ্ঠ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় দেড় হাজার সাহাবী সঙ্গে নিয়ে ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা নগরীর দিকে রওয়ানা হন। কিন্তু মক্কার উপকণ্ঠে হুদায়বিয়া নামক স্থানে তারা পৌঁছলে মক্কার মুশরিকরা তাদের বাধা দেয়। মুসলমানরা ছিলেন ইহরাম পরিহিত। ছিলেন মক্কার হারাম এলাকায়। কিন্তু কাফেররা সবরকম বিধান লঙ্ঘন করে মুসলমানদের পথ আটকে দেয়। শেষে তাদের

সঙ্গে সন্ধি করে সেখান থেকেই ফিরে আসতে হয় মুসলমানদের। আল্লাহ তাআলা তাই এই আয়াতে সতর্ক করে বলছেন- তারা তোমাদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করেছিল, তোমাদের ইহরামের সঙ্গে অন্যায় করেছিল, অন্যায়ভাবে তারা তোমাদের মসজিদে হারামে প্রবেশের পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল। তাই বলে তোমরা আবার তাদের ওপর জুলুম করে বসো না। তাদের অন্যায়ের কারণে তোমাদের মনে সৃষ্ট শত্রুতা আর বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে কিছুতেই সীমালঙ্ঘনের পথে নিয়ে না যায়। হিংসা আর বিদ্বেষের শেষ ফল যেহেতু একই-অন্যের ক্ষতি কামনা করা, তাই এর প্রতিকারের পদ্ধতিও অভিন্ন। যার প্রতি মনে বিদ্বেষ জন্ম নিয়েছে লোকসম্মুখে তার প্রশংসা করুন। আল্লাহ তাআলার কাছে তার গোনাহ মাফের জন্যে, তার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে দুআ করুন। দুআ করুন, দুনিয়া-আখেরাতে উভয় জাহানে সমূহ কল্যাণ যেন সে পেয়ে যায়। এর পাশাপাশি বিদ্বেষের যে কুফল পবিত্র হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে তাও স্মরণ করুন। চিন্তা করুন-বিদ্বেষ মনে রেখে যদি আল্লাহ তাআলার সাধারণ ক্ষমা থেকে মাহরূম হতে হয় তাহলে কী পরিণতি হবে! এবং যার প্রতি বিদ্বেষ, যে কষ্টের কারণে বিদ্বেষ, তা ক্ষমা করে দিন, মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিন। এ নিয়ত করুন, আমি আজ তাকে ক্ষমা করে দিলাম- এ আশায় যে, এর বিনিময়ে কাল কিয়ামতের কঠিন বিপদের মুহূর্তে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ এর মূল্যায়ন করবেন- আমার বান্দা হয়ে আরেক বান্দাকে ক্ষমা করে দিল, আমিও এ বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। মহান আল্লাহ কী পরিষ্কার ভাষায় আমাদেরকে এ ক্ষমার দিকে আহ্বান করেছেন, লক্ষ করুন- وَ جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَ اَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللهِ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ. মন্দের বদলা অনুরূপ মন্দ। তবে যে ক্ষমা করে দেয় ও সংশোধনের চেষ্টা করে তার সওয়াব আল্লাহর যিম্মায় রয়েছে। নিশ্চয়ই তিনি জালেমদেরকে পছন্দ করেন না। যারা নিজেদের ওপর জুলুম হওয়ার পর (সমপরিমাণে) বদলা নেয়, তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। অভিযোগ তো তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের ওপর জুলুম করে ও পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। এরূপ লোকদের জন্যে আছে যন্ত্রণাময় শাস্তি। আর প্রকৃতপক্ষে যে ছবর অবলম্বন করে ও ক্ষমা প্রদর্শন করে- এটা বড় হিম্মতের কাজ। -সূরা শূরা (৪২) : ৪০-৪৩ সহীহ বুখারী শরীফের হাদীস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই ব্যক্তিগত কোনো বিষয়ে কারও কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতেন না। যখন কেউ আল্লাহ তাআলার কোনো অধিকার লঙ্ঘন করত,

আল্লাহ তাআলা যা কিছু সম্মানিত করেছেন সেই সম্মান যখন কেউ ক্ষুণœ করত তখনই কেবল তিনি প্রতিশোধ নিতেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৭৮৬ প্রতিশোধ আর ক্ষমার বিষয়ে এই হচ্ছে আমাদের জন্যে নির্দেশনা, আমাদের আদর্শ। এভাবে যদি কাউকে ক্ষমা করে দেয়া যায়, পাশাপাশি তার জন্যে মনে থাকে কল্যাণকামনা আর দুআ, তাহলে মনের আকাশ থেকে বিদ্বেষের কালো মেঘ কেটে যাবেই। ক্ষোভ ও বিদ্বেষহীন জীবন তখন এনে দেবে এক নতুন স্বাদ, নতুন তৃপ্তি। বিদ্বেষের অবশ্য আরেকটি দিক আছে, যেটা নিন্দনীয় নয় মোটেও। বরং শরীয়তের দৃষ্টিতেই তা খুবই পছন্দনীয়। সেটার শিরোনাম দেয়া যায়-'আলহুব্বু ফিল্লাহ ওয়াল বুগযু ফিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর জন্যেই ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্যেই বিদ্বেষ। দ্বীনের জন্যে, আল্লাহ তাআলার জন্যে কেউ যদি কারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তাহলে তা পুরস্কারযোগ্যও। আল্লাহ তাআলার হুকুম যারা হরহামেশা অমান্য করে চলে, যারা তাঁর অবাধ্য, সাধারণ মুসলমানদের ঈমানের পথে আমলের পথে যারা বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাদের প্রতি মুমিন বান্দার অন্তরে বিদ্বেষ থাকাই স্বাভাবিক। এ বিদ্বেষ ঈমানের দাবি। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- مَنْ أَحَبَّ لِلّهِ وَأَبْغَضَ لِلّهِ وَأَعْطَى لِلّهِ وَمَنَعَ لِلّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ. যে আল্লাহর জন্যেই ভালোবাসে, আল্লাহর জন্যেই বিদ্বেষ পোষণ করে, আল্লাহর জন্যেই দান এবং আল্লাহর জন্যেই দান থেকে বিরত থাকে, সে তো ঈমানকে পূর্ণ করে নিল। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৬৮৩

হিংসা সম্পর্কিত তিনটি ঘটনায় তিন ধরনের শিক্ষা:

ঘটনা ১: হযরত ইউসুফ (আ:) রাতে স্বপ্নে দেখলেন এগারটি তারকা, চাঁদ ও সূর্য উনাকে সিজদা করছে। ঘুম থেকে উঠে যখন এই কথা উনার বাবা তথা ইয়াকুব (আ:) কে বললেন, তিনি ইউসুফ (আ:) কে বললেন , এই কথা যেন তিনি তার ভাইদেরকে না বলেন। কেননা তিনি জানতেন এই কথা উনার ভাইরা জানতে পারলে তাকে নিয়ে হিংসায় ফেটে পড়বে।* পরবর্তীতে সেটাই হয়েছে। নবীর সন্তান হয়েও তারা ভাইকে হিংসার কারনে হ/ত্যার উদ্দেশ্যে কুয়ায় নিক্ষেপ করেছিল। হিংসা এমন এক আগুন যা আপন পর চিনে না, বরং কাছের মানুষরদের থেকেই হিংসার শিকার হতে হয় আগে।

ঘটনা ২: আদম (আ:) এর কন্যা আকলিমাকে বিবাহ করা নিয়ে যখন বিরোধ দেখা দিল তখন আদম (আ:) তাঁর দুই সন্তান হাবিল ও কাবিল উভয়কে কুরবানি করার নির্দেশ দিলেন। হাবিলের কুরবানী আল্লাহর দরবারে কবুল হলো। এতে কাবিল তার ভাইয়ের প্রতি হিংসায় জ্বলে উঠলো এবং তাকে হ/ত্যা করলো।** ঘর বাড়ি অর্থ সম্পদ ইজ্জত সম্মান দেখেই যে শুধুমাত্র অন্যরা হিংসা করবে এমনটা নয় বরং ইবাদত তাকওয়া খোদাভিরুতা দেখেও অনেকে হিংসা করতে পারে।

ঘটনা ৩: মূসা (আ:) এর কাছে একদিন শয়তান উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর নবী! আপনি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করুন যেন আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দেয়। মূসা (আ:) আল্লাহর নিকট আরজ করলেন, হে আল্লাহ! শয়তান আপনার নিকট ক্ষমা চায়। আল্লাহ বললেন, হে মূসা! তুমি তাকে বল, সে যেন আগে আদম (আ:) এর কবরে গিয়ে তাকে সিজদা দেয়। যখন মূসা (আ:) শয়তানকে এ কথা জানালো তখন শয়তান উত্তর দিলো, আমিত তিনি জীবিত থাকতেই তাকে সিজদা করিনি আর এখন তাকে কবরে সিজদা করারতো প্রশ্নই আসেনা!*** অর্থাৎ সে অনন্তকাল জাহান্নামে জ্বলতে রাজি কিন্তু আদম (আ:) এর প্রতি তার যে হিংসাত্মক মনোভাব তা ছাড়তে রাজি নয়। ঠিক একই ভাবে কিছু মানুষও আছে যারা হিংসার ভয়াবহতা জানার পরেও তা থেকে নিজেকে বিরত রাখে না।(সুরা ইউসুফ, আয়াত: ৪-৫** সুরা মায়েদা, আয়াত: ২৭

বিদ্বেষ : আমল কবুলের এক শক্ত অন্তরায়

হিংসার পথ ধরেই আমাদের মনে আরেকটি রোগ জন্ম নেয়। একে আমরা বিদ্বেষ বলি। এমনিতেও শব্দ দুটি একে অন্যের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। হিংসা যেমন চুলার আগুনের মতোই আমাদের নেক আমলগুলো পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেয়, বিদ্বেষও তেমনি আড়াল হয়ে দাঁড়ায় আমাদের নেক আমলের সামনে। হাদীস শরীফে বিদ্বেষ পোষণকারীদের জন্যে সতর্কবার্তা উচ্চারিত হয়েছে, বিভিন্ন আঙ্গিকে, বিভিন্ন উপস্থাপনায়। বিদ্বেষের ভয়াবহতা আমরা একটি হাদীস থেকে কিছুটা আন্দাজ করতে পারি। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : إِنّ الله لَيَطّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، إِلّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ. অর্ধ শাবানের রাতে (অর্থাৎ শবে বরাতে) আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল সৃষ্টিকেই ক্ষমা করে দেন। তবে তিনি মুশরিক ও বিদ্বেষপোষণকারীকে ক্ষমা করেন না। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৩৯০

এই হাদীসে দুটি বিষয় লক্ষণীয় : এক. আল্লাহ তাআলা শবে বরাতে যখন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন, তাঁর সকল সৃষ্টিই যখন সেই ক্ষমা লাভে ধন্য হয়, তখনো

বিদ্বেষপোষণকারী কেউ এ ক্ষমা পাবে না। দুই. বিদ্বেষপোষণকারীকে এ হাদীসে মুশরিকের সহযাত্রী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মুশরিককে যেমন ওই রাতে ক্ষমা করা হয় না, তেমনি বিদ্বেষপোষণকারীকেও ক্ষমা করা হয় না। মুশরিক তো সে-ই, যে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে শিরক করে। আর শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় কবিরা গোনাহ। শিরক করার পর তওবা না করে যে মারা যাবে তার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা খুবই স্পষ্ট- اِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا নিশ্চয় আল্লাহ তার সঙ্গে শিরক করাকে ক্ষমা করবেন না, এছাড়া অন্য কিছু যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। আর যদি কেউ আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে তাহলে সে তো এক মহাপাপে জড়িয়ে পড়ল। -সূরা নিসা (৪) : ৪৮ এই হচ্ছে শিরক আর মুশরিকের পরিচয়। এ মুশরিকের সঙ্গে যখন কাউকে জুড়ে দেয়া হয় তখন তার হতভাগ্য আর অশুভ পরিণতি সম্পর্কে বিস্তারিত বলার প্রয়োজন থাকে না। একদিকে সাধারণ ক্ষমা থেকে বঞ্চিত, অপরদিকে মুশরিকের সহযাত্রী। বিদ্বেষকারীর গন্তব্য তাহলে কোথায়! মুসনাদে আহমাদের রেওয়ায়েতে উপরোক্ত হাদীসটি উল্লেখিত হয়েছে এভাবে- يَطَّلِعُ اللَّهُ عَزّ وَجَلّ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلاَّ لِاثْنَيْنِ: مُشَاحِنٍ ، وَقَاتِلِ نَفْسٍ. অর্ধ শাবানের রাতে আল্লাহ তাআলা আপন সৃষ্টির দিকে সদয় দৃষ্টিতে তাকান। তখন তিনি তাঁর বান্দাদের ক্ষমা করে দেন। তবে দুইজনকে নয়-বিদ্বেষ পোষণকারী আর মানুষ হত্যাকারী। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৬৬৪২ এই হাদীসে বিদ্বেষপোষণকারীর সঙ্গী মানুষ হত্যাকারী। অন্যায়ভাবে কেউ যখন কাউকে হত্যা করে সেটা তো কুরআনের ভাষায় সকল মানুষকে হত্যার সমান অপরাধ! কুরআনের ভাষায় দেখুন- كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا আমি বনী ইসরাইলকে এ বিধান দিয়েছিলাম, যদি কেউ কাউকে হত্যা করে, প্রাণের বিনিময় কিংবা পৃথিবীতে বিশৃংখলা ছড়ানোর অপরাধে নয়, তাহলে সে যেন সকল মানুষকেই হত্যা করল। -সূরা মায়িদা (৫) : ৩২ আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- تُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِى كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ فَيَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا প্রতি বৃহস্পতিবার ও সোমবার মানুষের আমল (আল্লাহ তাআলার সামনে) পেশ করা হয়। তখন আল্লাহ এমন সকল মানুষকে ক্ষমা করে দেন, যে তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করে না। তবে এমন দুজনকে তিনি ক্ষমা করেন না, যাদের অন্তরে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ রয়েছে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়-তাদের দুজনকে দেখো, তারা

একে অন্যের সঙ্গে মিলে যায় কি না। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৬৫ এই তো বিদ্বেষ! এই বিদ্বেষ বান্দার আমল কবুল হওয়ার পথে এক শক্ত দেয়াল। প্রতি সপ্তাহে দুদিন যখন বান্দার যাবতীয় আমল আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়, আর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ঘোষিত হয় সাধারণ ক্ষমা, তখনো বিদ্বেষপোষণকারীরা বঞ্চিত। কথা হলো, বিদ্বেষ কী? খুব সহজ ভাষায় বিদ্বেষের পরিচয় দিয়েছেন হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রাহ.। তিনি বলেছেন, স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে নিজের অন্তরে কারও প্রতি অশুভ কামনা পোষণ করা আর তাকে কষ্ট দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করাই হচ্ছে বিদ্বেষ। অর্থাৎ কারও সম্পর্কে এমন কামনা করা-সে কষ্টে পড়–ক, তার ক্ষতি হোক, তার ব্যবসায় লোকসান হোক ইত্যাদি; এর সঙ্গে তাকে কষ্ট দেয়া এবং ক্ষতি করার তৎপরতা চালানো। আর যদি ওই ব্যক্তি কোনো বিপদে পড়ে, তার কোনো ক্ষতি হয় তাহলে আনন্দিত বোধ করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদ্বেষের মূলে থাকে ক্রোধ ও ক্ষোভ। কেউ কাউকে কষ্ট দিলে যদি সঙ্গে সঙ্গে সে ওই কষ্টের প্রতিবিধান করতে পারে, প্রতিশোধ নিয়ে নিতে পারে তাহলে মনে আর ক্ষোভ থাকে না। কিন্তু আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে যদি কোনো কারণে কেউ প্রতিশোধ নিতে না পারে, তাহলে অন্যায়কারীর প্রতি মনে ক্ষোভ জন্ম নেয়। হতে পারে সে বয়সে বড়, কিংবা তার ক্ষমতা অনেক বেশি, অথবা সমাজের চোখে সে এতটাই মর্যাদাবান যে, আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাকে কিছুই করতে পারবে না। এমন পরিস্থিতিতে কারও কাছে বিচারও প্রার্থনা করা যায় না, আবার প্রতিশোধও নেয়া যায় না। এভাবে যখন মনে ক্ষোভ জন্ম নেয়, আর এ ক্ষোভ নিরসনের কোনো পথ সামনে থাকে না, তখনই ধীরে ধীরে এ ক্ষোভ বিদ্বেষে রূপ নেয়। নিজে প্রতিশোধ নিতে না পারায় এখন কামনা করে-তার যদি কোনো ক্ষতি হতো। পাশাপাশি এ অপেক্ষায়ও থাকে-যদি কখনো সুযোগ হয় তাহলে তাকে আমি দেখে নেব! আমাকে সে আর কতটুকু ভুগিয়েছে, আমি তাকে এর দশগুণ ভোগাব! এরই নাম বিদ্বেষ। এর অবধারিত ফল-যখনই সে সুযোগ পাবে, তাকে কষ্ট দেবে। পারলে হাতে কষ্ট দেবে, তা না পারলে মুখে কষ্ট দেবে। সুযোগ পেলেই তার গীবত করবে, নিন্দা-সমালোচনা করবে। এটাই হচ্ছে বিদ্বেষের কুফল। সুযোগ পেলে সে যদি নিজের আঘাত পরিমাণ কষ্ট দিত তাহলে একটা কথা ছিল। এতটুকু প্রতিশোধ নেয়া বৈধ- সন্দেহ নেই। কিন্তু দীর্ঘদিনের চাপা ক্ষোভ আর বিদ্বেষের ফলে কখনো সুযোগ পেয়ে সে যদি আঘাতপ্রাপ্ত থাকার পরিবর্তে আঘাতকারী হয়ে পড়ে, যতটুকু অপরাধ তার সঙ্গে করা হয়েছিল সে যদি প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ওই মাত্রা ছাড়িয়ে যায় বহুগুণে, তাহলে এটা নিশ্চিত অপরাধ। মোটকথা, বিদ্বেষ যখন মনে মনে

লালন করতে থাকে, তখন তা আমল কবুল হওয়ার পথে আড়াল হয়ে দাঁড়ায়, একে মনে পোষণ করে বঞ্চিত থাকতে হয় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ঘোষিত সাধারণ ক্ষমা থেকে, আর শেষে যখন তা মনের গণ্ডি পেরিয়ে বাইরে আসার সুযোগ পায় তখন সীমা অতিক্রমের ফলে হয়ে পড়ে উল্টো অপরাধী। এতদিনের মজলুম এখন জালেম। জালেম হয়ে পড়ে মজলুম। অসম্ভব কী, এখন নতুন মজলুমের মনে সৃষ্টি হবে ক্ষোভ ক্রোধ আর বিদ্বেষ? বিদ্বেষের কালো মেঘ যখন মনে জমাট বাঁধতে থাকে দিনের পর দিন, এরপর দীর্ঘ অপেক্ষা পেরিয়ে প্রতিশোধের সুযোগ হাতে আসে তখন সীমা ছাড়িয়ে এভাবে জালেম হয়ে পড়ার আশংকাই প্রবল। আল্লাহ তাআলা তাই সতর্ক করছেন এভাবে- وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا . তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে বাধা দিয়েছিল- এ কারণে কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সীমালঙ্ঘন করতে প্ররোচিত না করে। -সূরা মায়িদা (৫) : ২ ঘটনাটি ছিল এমন- হিজরি ষষ্ঠ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় দেড় হাজার সাহাবী সঙ্গে নিয়ে ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা নগরীর দিকে রওয়ানা হন। কিন্তু মক্কার উপকণ্ঠে হুদায়বিয়া নামক স্থানে তারা পৌঁছলে মক্কার মুশরিকরা তাদের বাধা দেয়। মুসলমানরা ছিলেন ইহরাম পরিহিত। ছিলেন মক্কার হারাম এলাকায়। কিন্তু কাফেররা সবরকম বিধান লঙ্ঘন করে মুসলমানদের পথ আটকে দেয়। শেষে তাদের সঙ্গে সন্ধি করে সেখান থেকেই ফিরে আসতে হয় মুসলমানদের। আল্লাহ তাআলা তাই এই আয়াতে সতর্ক করে বলছেন- তারা তোমাদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করেছিল, তোমাদের ইহরামের সঙ্গে অন্যায় করেছিল, অন্যায়ভাবে তারা তোমাদের মসজিদে হারামে প্রবেশের পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল। তাই বলে তোমরা আবার তাদের ওপর জুলুম করে বসো না। তাদের অন্যায়ের কারণে তোমাদের মনে সৃষ্ট শত্রুতা আর বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে কিছুতেই সীমালঙ্ঘনের পথে নিয়ে না যায়। হিংসা আর বিদ্বেষের শেষ ফল যেহেতু একই-অন্যের ক্ষতি কামনা করা, তাই এর প্রতিকারের পদ্ধতিও অভিন্ন। যার প্রতি মনে বিদ্বেষ জন্ম নিয়েছে লোকসম্মুখে তার প্রশংসা করুন। আল্লাহ তাআলার কাছে তার গোনাহ মাফের জন্যে, তার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে দুআ করুন। দুআ করুন, দুনিয়া-আখেরাতে উভয় জাহানে সমূহ কল্যাণ যেন সে পেয়ে যায়। এর পাশাপাশি বিদ্বেষের যে কুফল পবিত্র হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে তাও স্মরণ করুন। চিন্তা করুন-বিদ্বেষ মনে রেখে যদি আল্লাহ তাআলার সাধারণ ক্ষমা থেকে মাহরূম হতে হয় তাহলে কী পরিণতি হবে! এবং যার প্রতি বিদ্বেষ, যে কষ্টের কারণে বিদ্বেষ, তা

ক্ষমা করে দিন, মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিন। এ নিয়ত করুন, আমি আজ তাকে ক্ষমা করে দিলাম- এ আশায় যে, এর বিনিময়ে কাল কিয়ামতের কঠিন বিপদের মুহূর্তে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ এর মূল্যায়ন করবেন- আমার বান্দা হয়ে আরেক বান্দাকে ক্ষমা করে দিল, আমিও এ বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। মহান আল্লাহ কী পরিষ্কার ভাষায় আমাদেরকে এ ক্ষমার দিকে আহ্বান করেছেন, লক্ষ করুন- وَ جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَ اَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللهِ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَ يَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ. মন্দের বদলা অনুরূপ মন্দ। তবে যে ক্ষমা করে দেয় ও সংশোধনের চেষ্টা করে তার সওয়াব আল্লাহর যিম্মায় রয়েছে। নিশ্চয়ই তিনি জালেমদেরকে পছন্দ করেন না। যারা নিজেদের ওপর জুলুম হওয়ার পর (সমপরিমাণে) বদলা নেয়, তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। অভিযোগ তো তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের ওপর জুলুম করে ও পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। এরূপ লোকদের জন্যে আছে যন্ত্রণাময় শাস্তি। আর প্রকৃতপক্ষে যে ছবর অবলম্বন করে ও ক্ষমা প্রদর্শন করে- এটা বড় হিম্মতের কাজ। -সূরা শূরা (৪২) : ৪০-৪৩ সহীহ বুখারী শরীফের হাদীস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই ব্যক্তিগত কোনো বিষয়ে কারও কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতেন না। যখন কেউ আল্লাহ তাআলার কোনো অধিকার লঙ্ঘন করত, আল্লাহ তাআলা যা কিছু সম্মানিত করেছেন সেই সম্মান যখন কেউ ক্ষুণœ করত তখনই কেবল তিনি প্রতিশোধ নিতেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৭৮৬ প্রতিশোধ আর ক্ষমার বিষয়ে এই হচ্ছে আমাদের জন্যে নির্দেশনা, আমাদের আদর্শ। এভাবে যদি কাউকে ক্ষমা করে দেয়া যায়, পাশাপাশি তার জন্যে মনে থাকে কল্যাণকামনা আর দুআ, তাহলে মনের আকাশ থেকে বিদ্বেষের কালো মেঘ কেটে যাবেই। ক্ষোভ ও বিদ্বেষহীন জীবন তখন এনে দেবে এক নতুন স্বাদ, নতুন তৃপ্তি। বিদ্বেষের অবশ্য আরেকটি দিক আছে, যেটা নিন্দনীয় নয় মোটেও। বরং শরীয়তের দৃষ্টিতেই তা খুবই পছন্দনীয়। সেটার শিরোনাম দেয়া যায়-'আলহুব্বু ফিল্লাহ ওয়াল বুগযু ফিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর জন্যেই ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্যেই বিদ্বেষ। দ্বীনের জন্যে, আল্লাহ তাআলার জন্যে কেউ যদি কারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তাহলে তা পুরস্কারযোগ্যও। আল্লাহ তাআলার হুকুম যারা হরহামেশা অমান্য করে চলে, যারা তাঁর অবাধ্য, সাধারণ মুসলমানদের ঈমানের পথে আমলের পথে যারা বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাদের প্রতি মুমিন বান্দার অন্তরে বিদ্বেষ থাকাই স্বাভাবিক। এ বিদ্বেষ ঈমানের দাবি। হাদীস শরীফে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ. যে আল্লাহর জন্যেই ভালোবাসে, আল্লাহর জন্যেই বিদ্বেষ পোষণ করে, আল্লাহর জন্যেই দান এবং আল্লাহর জন্যেই দান থেকে বিরত থাকে, সে তো ঈমানকে পূর্ণ করে নিল। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৬৮৩

উপসংহারঃ

হিংসা সাধারণত একটি খারাপ গুণ।যা মানুষকে ধীরে ধীরে ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়।হিংসা মানুষের নেক আমলকে ধ্বংস করে।তাই আমাদের উচিত হিংসা থেকে নিজের নফসকে রক্ষা করা,নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি।